মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

তওহীদের তত্ত্বকথা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

শুরু কথা

তাওহীদ দ্বীন-ইসলাম মর্মবানী। ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেরই মানস-লোকে তাহা ঝংকৃত হইয়া ওঠা একান্তই বাঞ্চনীয়। কিন্তু আমার পক্ষে আজ একথা অস্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, এতদ্দেশে প্রচলিত দ্বীনি মাদ্রাসার উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষালাভ এবং পাঠ্যপুস্তক হিসাবে তাফসীর ও হাদীসের বিশুদ্ধতম গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াও তাওহীদের সঠিক ধারণা অন্তর্নিহিত ভাবধারার সহিত বিন্দুমাত্রও পরিচিত হইতে পারি নাই। ইহার সহিত আমার সত্যিকার ভাবে প্রথম পরিচয় ঘটে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতী পুস্তকাদীর সহিত পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে। সে আজ হইতে দীর্ঘ বাইশ বছর পূর্বের কথা। যেদিন সেই সব পুস্তক গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলাম সেদিন তাওহীদের মর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলাম, শুধু তাহাই নয়, ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করাও আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সেদিন এই উপলব্ধি আমার বড় বড় কিতাব পড়া মগজে এক প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, খুলিয়া গিয়াছিল আকিদা বিশ্বাসের রূদ্ধ কপাট। কুরআন হাদীস ও পড়িয়া-আসা জ্ঞানতত্ত্ব ও তথ্য এই উপলব্ধির বিদ্যুৎস্পর্শে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছিল। তখন আল্লাহ তাআলার এ তাওহীদী দ্বীনের প্রতি নতুন করিয়া ঈমান আনিতে পারিয়াছিলাম। সেদিন স্পষ্ট মনে হইয়াছিল, অবিশ্বাস অজ্ঞানতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিমেষে বিলীন হইয়াছে, তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সৃষ্টিলোক ও মানবজীবনের সন্ধান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে সৃষ্টিলোক ও মানবজীবনের গভীরতম অর্থ এবং তাৎপর্য।

সেদিন এ তাওহীদী দ্বীনকে নতুন করিয়া শুধু গ্রহণ-ই করা হয় নাই; জীবনে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বিশ্ব-সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করার কঠিনতম সাধনা ও সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও এক বিন্দু কুণ্ঠা জাগ্রত হয় নাই। জন্ম ও জীবন ধন্য হওয়ার মত অনুরূপ কোন ঘটনা আমার জীবনে আর একটিও ঘটে নাই।

চিন্তা বিশ্বাসের সেই বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা-প্লাবন সেদিন আমার মানসলোকে যেমন খরস্রোতের সৃষ্টি করিয়াছিল, লেখনীর ভোঁতা তলোয়ারকেও করিয়া তুলিয়াছিল তীক্ষ্ণ শাণিত। বাক শক্তির অক্ষমতাও সেদিন আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল ব্যাকুল কণ্ঠে।

আজ হইতে দীর্ঘ ঊনিশ-বিশ বৎসর পূর্বে তাওহীদের যে উপলব্ধি আমি গত করিয়াছিলাম, তাহা যেমন মুখের শব্দের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তেমনি ভাষার পরিচ্ছেদ ভূষিত হইয়া তাহা উপস্থিত হইয়াছিল অনেক দৃষ্টিমানের সম্মুখে।
তাওহীদ উপলব্ধির সে নির্ঝর স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, বহু চড়াই উতরাই অতিক্রম করিয়া তাহা দুরন্ত গতিতে ছুটিয়াছিল সাগর সংগ্রামে, নির্গত হইয়াছিল বহু শাখা প্রশাখা।

সেইদিনের উপলব্ধি ভাষার যে রূপ লাভ করিয়াছিল, আজ তাহাই গ্রন্থাকারে পেশ করিলাম বৃহত্তর জন সমাজের সম্মুখে। পেশ করিলাম এই আশা বুকে বাঁধিয়া যে, হয়ত ইহা আমার মত আরো অনেকের হৃদয়ের বদ্ধ কটাট খুলিয়া দিবে; চিন্তা-বিশ্বাস, নীতি-আদর্শ এবং বাস্তব কর্ম পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি হইবে এবং অনেকেই বাধ্য করিবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক অভীযানে নির্ভীকভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতে।

বিশাল মানস সরোবরের এপারে যে আলোড়ন জাগিয়াছে, দূরবর্তী তট রেখায় তাহা কোন স্পন্দন জাগাইবে কিনা, বলা দুষ্কর। কিন্তু তবুও আশা পোষণ ও সম্ভবনার স্বীকৃতিতে অন্যায় কিছুই নাই।

মুস্তফা মনজিল
২০৮ নাখালপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম
১০/০৯/৬৭ ইং

তাওহীদ

ইসলামী জীবন-ধারার মূল ভিত্তি হইতেছে তাওহীদ। তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ-কোন কিছুকে এক ও একক বলে স্বীকার করা। ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ বলিতে বুঝায় সৃষ্টিকর্তাকে এক ও অদ্বিতীয় রূপে বিশ্বাস করা। নিখিল সৃষ্টি করিয়াছেন যে মহান শক্তিমান সত্তা তিনি এক; কোন দিক দিয়াই তাঁহার কোন শরীক নাই। ইসলামের পরিভাষায় তিনিই হলেন আল্লাহ তাআলা।

চারিদিকে বিস্তৃত এই বিশাল বিশ্ব প্রকৃতির বাহ্যরূপ মনোরম শ্যামল শোভা মানুষের মনকে মুগ্ধ করে, মানুষের মনে জাগাইয়া দেয় এক অসীম ক্ষমতাশীল সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় শক্তি ও প্রতিভার কথা। দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখার জন্য পৃথিবীর এই বিরাট কারখানাটিকে অহর্নিশ একান্তভাবে কর্মব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। ধানের একটি চারা অংকুরিত হইতে পারে না, যতক্ষণ না এই বিশ্বপ্রকৃতির বুকে নিহিত প্রয়োজনীয় সমগ্র উপাদান উহার লালন পালনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্ধনের জন্য নিজ নিজ শক্তি পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিয়া দেয়। মাটি দেয় দাঁড়াইবার আশ্রয়-শিকড় ছড়াইবার জন্য নরম বিস্তৃত ভূমি; বৃষ্টি দেয় পানির অংশ। সূর্যের উত্তাপ, শিশিরের শীতলতা আর বায়ুর কোমল স্নেহের স্পর্শ এই সবই নির্দিষ্ট নিয়মে ও পরিমাণে মিলিত হয় বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গে। আর তাহার পরই ধানের একটি গাছ উহার শীর্ষ-দেশে সোনালী বর্ণের কয়েকটি ছড়া সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। এমন কি, এই উপাদনগুলি সমানভাবে সমাবেশ না হইলে পৃথিবীর একটি জিনিসও সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু কেন এইরূপ হয়?

মায়ের গর্ভে এক ফোঁটা শুক্র কেন সৃষ্টি করিবে হাড়-মাংস, অস্থিমজ্জা বিশিষ্ট একটা সুঠাম, সুগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ। সূর্য চন্দ্রের উদয়-অস্ত,রাত্র দিনের আবর্তন, বায়ুর গতি ও ঋতুর পরিবর্তন হয় কিরূপে? কে সৃষ্টি করিল এই বিরাট বিশাল বিশ্বলোককে? মানুষের মনে এই জিজ্ঞাসা শুধু আদিমই নয়-সম্পূর্ণ রূপে মৌলিক, চিরন্তন ও শাশ্বত। এই প্রশ্নের একমাত্র জাওয়াব এই যে, সারে জাহানের একজন সৃষ্টিকর্তা রহিয়াছেন, তিনিই নিজ ক্ষমতায় নিজেরই পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন গোটা বিশ্বকে। তাহারই নির্ধারিত বিধান অনুসারে সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি কাজই অনুষ্ঠিত হয়, আকষ্কিকভাবে একটি দুর্ঘটনা হিসাবে আপনা আপনিই সৃষ্টি হয় নাই এই বিশ্বলোক। কার্যকরণ সমন্বিত এই দুনিয়ার কোন কিছুই বিনা কারণে কর্মের কর্তা ছাড়া কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না। কাজেই এই বিরাট বিশ্ব-ভুবনের পশ্চাতেও রহিয়াছে এক অসীম ক্ষমতাশালী সৃষ্টিকর্তা।

এমন একটা দোকানের কথা কেহই ধারণা করিতে পারে না, যেখানে আপনা আপনিই রীতিমত কেনা বেচা চলিতেছে, মূল্য দেওয়া-নেওয়া হইতেছে, এক জিনিস বিক্রি হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আসিয়া ভর্তি হইতেছে আরও অনেক দ্রব্য-সম্ভার-অথচ দোকানী সেখানে কেহই নাই। যন্ত্র-বিজ্ঞানের যুগে এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারিলেও উহার পশ্চাতেই এই বিশ্বলোকের সৃষ্টি হইয়াছে মনে করিলেও প্রশ্ন হয়: সেই জড়কে। সৃষ্টি করিল কে, জড়ের ভিতরে কোথা হইতে সমাবিষ্ট হইল এই বিস্ময়কর বিশ্ব সৃষ্টির মত অলোকিক ক্ষমতা সম্পন্ন জড় কে নিত্য নতুন বিশ্লেষণ দিয়া জড়কে তুলিয়া ধরিতে হইয়াছে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র শক্তি-উৎস রূপে! বলিতে হইবে আল্লাহ বিদ্বেষীদের ইহা আংশিকভাবে হইলেও সেই সৃষ্টিকর্তারই স্বীকৃতি যাঁহার পরিপূর্ণ পরিচয় রহিয়াছে কুরআন মজিদে। আল্লাহ তাআলাই সেই জড় দ্বারা সৃষ্টি করিয়েছেন নিখিল বিশ্ব ভূবনকে ।তাঁহারই ক্ষমতার অনিবার্য প্রভাবে জড় হইতে জীবন ও চৈতন্য আর অ-মন হইতে মন-এ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভব হইয়াছে।

বিশ্বসৃষ্টি যেমন কোন সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে নাই, অনুরূপভাবে সে সৃষ্টিকর্তা একজন না হইয়া-একাধিক হইলেও এই সৃষ্টিলোক কিছুতেই অস্তিত্ব লাভ করিতে পারিত না। একাধিক স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী, স্বয়ংসম্পূর্ণ, ক্ষমতাশীল সত্তার অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, এই বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে তাহাদের সকলেরই অংশীদারিত্ব স্বীকার করাও হাস্যকর! বিশ্ব ভূবনের চারিদিকে যে নিবিড় সামঞ্জস্য ও গভীর ঐক্য বিদ্যামান কোথাও কোন একটি ক্ষেত্রেও নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না; ইহা সম্ভব হইত না যদি এখানে একাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতাশালীর নিরংকুশ কর্তৃত্ব কার্যকর হইত। নিখিল-বিশ্বভূবনকে তাহা হইলে সুন্দর ও অজস্র শোভায় মন্ডিত নিখুঁত এক ঐক্য রূপে দেখিতে পাওয়া যাইত না। কারণ বিভিন্ন রুচি ও বহু স্বতন্ত্র নিরুংকুশ ইচ্ছার সংঘর্ষে কোন শৃংখলা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিস হইতে পারেনা। একথা অনুস্বীকার্য!

তাহছাড়া, আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপক ও পরিচালক যদি ভিন্ন ভিন্ন হইতে, কিংবা এইসব অসংখ্যা রুচি ও ইচ্ছার লীলাক্ষেত্র হইত এই জগত, অথবা ভাল ও মন্দ, আলো ও অন্ধাকারের সৃষ্টিকর্তা যদি আলাদা হইত, তাহা হইলে বিশ্বভূবনের এই বিপুল ও বিভিন্ন অংশ উপাদানের মধ্যে এইরূপ নিবিড় মিলন, ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকিতে পারিত না। বরং তাহাদের একজনের সাথে অন্যজনের এবং একটি উপাদানের সহিত অন্য উপাদানের অনিবার্য সংঘর্ষে সৃষ্টি জগত কোন দিন যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মহাশূন্যে বিলিন হইয়া যাইত, তাহার কোনই ইয়াত্তা ছিলনা। বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে মৌলিক উপাদান সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন। মাটির গভীরে হাজার হাজার মাইল নিম্ন-দেশের এক টুকরা ধাতু, আটলান্টিক মহাসাগারের অতল গভীরে একটি শুক্তি, আর লক্ষকোটি মাইল

ঊর্দ্ধলোকের নিষ্প্রভ কোন নক্ষত্রের একটি কংকর পাশাপাশি রাখিয়া অণুবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে এই কয়টি উপাদানিক একত্ব ও অভিন্নতা দর্শনে বিস্ময়ের সীমা থাকিবেনা এই তিনটি বস্তুর মৌলিক উপাদাদ হইতেছে সেই বিদ্যুৎ-কণা যাহা একটি ধূলিকণা, ফুলের পাঁপড়ি খন্ড, শিশির বিন্দু, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহগুলিতে সমানভাবে বর্তমান। সৃষ্টকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার এবং তাহার একত্ববাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায়। ইসলামের তাওহীদ একটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য মাত্র নয়। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পরিপূর্ণ ক্ষেত্রেও একমাত্র ভিত্তি এই তাওহীদ। বস্তুত ; এই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহাকে এক ও একক মানিয়া লইলেও কোনই লাভ হয় না, যদি না মানুষের বাস্তব কর্মজীবনে তাহার অনিবার্য প্রভাবকে স্বীকার করা হয়। তাই বিরাট বৃক্ষের সাথে তাওহীদের তওলনা করা চলে। নির্দিষ্ট একটি গাছকে স্বীকার করিলে উহার বীজ ও শিকড় হইতে শুরু করিয়া উহার কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল সব কিছুই স্বীকার করিয়া নিতে হয়, অন্যথায় বৃক্ষকে স্বীকার করা সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া যায়। তাই আল্লাহ তাআলা শুধু সৃষ্টিকর্তাই নহে; তিনি পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপকও বটে। মানুষের জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, আল্লাহ ছাড়া কেহ নাই কেহ হইতে পারেনা । ভয় করিতে হয়, মাথা নাত করা যায়, জীবিকার জন্য প্রর্থনা করা যায় একমাত্র তাঁহারই সম্মুখে। সমগ্র জীবন ভরিয়া তাঁহারই সন্তোষ লাভ করার জন্য কাজ করিতে হয় সকল মানুষকে। সমগ্র জীবন ভরিয়া তাঁহারই সন্তোষ লাভ করার জন্য কাজ করিতে হয় সকল মানুষকে। কারণ মানুষের ক্ষতি বা কল্যাণ করিতে পারে, সকল প্রকার দু:খ-মুসীবৎ হইতে রক্ষা করিতে পারে-আল্লাহ ছাড়া এমন কেহ কোথাও নাই।

ইসলাম কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসাবেই আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, মানুষের বাস্তব কর্মজীবনে ও জীবনের প্রত্যেকটি কাজে ও প্রত্যেকটি ব্যাপারে একমাত্র তাঁহারই নিরুংকুশ প্রাধান্য ও কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথায় আল্লাহকে স্বীকার করা, আর না করা দুই-ই সমান। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ইহাই দার্শনিক ভিত্তি। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করা হইয়াছে ইসলামের বিস্তারিত বাস্তব ও ব্যবহারিক কর্মবিধি।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রধানত : পাঁচটি বিভাগ রহিয়াছে। এই পাঁচটি বিভাগের সমষ্টিগত রূপই হইতেছে মানুষের সমগ্র জীবন। তাওহীদের আলোকে প্রত্যেকটিরই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এখানে করা যাইতেছে।

প্রথম, মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত-বন্দেগীর দিক। এখানে তাওহীদের অর্থ হইবে এই যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, ভয় করার যোগ্য হিসাবে এক আল্লাহ

ছাড়া আর কাহাকেও স্বীকার করিবে না। মানুষ একান্তভাবে আল্লাহরই সম্মুখে মাথা নত করিবে, জীবন ভরিয়া কেবল তাঁহারই দাসত্ব করিবে। তাঁহারই একনিষ্ঠ অনুগত দাস হিসাবে জীবন যাপন করিবে।

দ্বিতীয়, মানুষের সমাজ জীবন। সমাজ জীবনে তাওহীদের মূল কথা হইতেছে সৃষ্টিকর্তার একত্বের অনুরূপ সমগ্র মানুষের ঐক্য। পৃথিবীর সকল মানুষ এক-একই বংশ হইতে উদ্ভুত; দেশ, কাল, বংশ, জাতি, বর্ণ, ভাষা, ভৌগলিক সীমারেখা বা অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ দ্বারা মানুষের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা যায় না। কেহ এখানে উচ্চ নয়, কেহ নীচ নয়, কেহ কাহারো প্রভু, হর্তা-কর্তা নয়।

তৃতীয়, মানুষের রাজনৈতিক দিক। মানুষকে সমাজবদ্ধ হইয়াই বসবাস করিতে হয়। আর সমাজবদ্ধ মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদের মধ্যে সুবিচার স্থাপন রাষ্ট্র ব্যতীত সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের দুইটি দিক প্রধান, একটি উহার উপর প্রভুত্ব ও নিরুংকুশ কর্তৃত্ব করারঅধিকার-যাহার উপর স্থাপিত হয় রাষ্ট্রের ভিত্তি, আর অপরটি হইতেছে আইন-বিধান রচনা। এই দুইটির দিক দিয়াই একমাত্র আল্লাহ তাআলারাই নিরুংকুশ প্রভুত্বো আইন রচনার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাকেই প্রভু বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহারই দেওয়া বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করিতে হইবে। মানুষের প্রভুত্ব ও মানুষের আইন রচনার নিরংকুশ অধিকার স্বীকার করা পরিষ্কার শিরক।

চতুর্থ, মানুষের অর্থনৈতিক দিক। সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। অতএব তিনিই সব কিছুর একমাত্র মালিক। তাঁহারই একচ্ছত্র মালিকানা ভিত্তিতে আর মানুষের প্রতিনিধিমূলক ভোগাধিকারের ভিত্তিতে রচিত হইবে মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তাওহিদী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার নিরংকুশ অধিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাওহিদী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানার নিরুংকুশ অধিকার বা পুঁজিবাদ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানা হরণ করিয়া রাষ্ট্রীয়করণ অন্য কথায় সমাজতন্ত্রও স্বীকৃত নয়।

পঞ্চম হইতেছে আন্তর্জাতিক জীবন। প্রথমোল্লেখিত চারটি বিভাগে তাওহীদ-আল্লাহর একত্বকে স্বীকার না করার দরুণই সৃষ্টি হয় আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম। অন্য মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সংশ্লিষ্ট দেশের ধনমাল স্বাধীনভাবে লুণ্ঠন করিয়া ও অন্য মানুষের উপরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য স্থাপনের জন্যই একদল মানুষ অপর মানব সমাজের উপর প্রবল বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আর যতদিন মানব সমাজে তাওহীদ স্বীকৃত না হইবে, তাওহীদী বিধান অনুযায়ী যতদিন না মানুষের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন গঠন করা হইবে, ততদিন এই আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের

অবসান হইতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব সমস্যারও একমাত্র সমাধান এএই তাওহীদ। ইসলামের পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া বিশ্বমানবকে আহ্বান জানানো হইয়াছে কুরআনের এই ভাষায় :

বল, হে কিতাবধারী লোকেরা, তোমরা আস এমন একটি বাণীর দিকে যাহা তোমাদের আমাদের মাঝে সর্বোতভাবে সমান। আর তাহা এই যে, আমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও দাসত্ব করিব না, তাঁহার সহিত কোন কিছুকেই শরীক কিরব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়া পরস্পরকেও রব্বরূপে গ্রহণ করিব না।

তাহারা যদি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে, তবে তোমরা বল :তোমরা সাক্ষী থাকিও যে, আমরা কিন্তু এক আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণকারী মুসলিম।

(একটি রেডিও কথিকা)

চারিদিকে বিস্তৃত এই বিশাল প্রকৃতির বাহ্যরূপ এবং ইহার মনোরম শ্যামল শোভা প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষকেই অনিবার্যরূপে আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে। আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, এই দুনিয়ায় কোন একটি জিনিস সম্পর্কেও নির্বার থাকিতে পারে না। দূর আকাশ হইতে এই ভূলোক পর্যন্ত পর্ত্যেকটি বস্তু-প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত মানুষকে রীতিমত ভাবাইয়া তোলে, জাগাইয়া দেয় তাহার ভিতরের সৌন্দর্যনুভূতি এবং যখন সে তার চতুষ্পার্শ্বের এই মনোমুদ্ধকর আবেষ্টনীর প্রোজ্জল রূপ দেখিতে পায়, তখনি তাহার ভিতরের মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠে এই বিপুল শোভামন্ডিত জগতের সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া?

এই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসই বহু বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত। সেই উপাদানগুলি পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণূকে কেন্দ্র করিয়া অহর্নিশ আবর্তিত হইতেছে ইলেক্ট্রন ও প্রোট্রন। ইহাতে একটা ন নেগেটিভ, অন্যটা পজিটিভ। অন্য কথায় একটা স্ত্রী অন্যটা পুরুষ। ইহাদের সুনিয়ন্ত্রিত আবর্তনের দরুণ সৃষ্টির প্রত্যেকটা বস্তু বাঁচিয়া থাকে। নারী ও পুরুষ দেহ ও প্রকৃতির দিক দিয়া, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমার দিক দিয়া কতইনা বিভিন্ন। কিন্তু তবুও ইহাদের মধ্যে যে মানসিক ও দৈহিক মিলন-প্রীতি বর্তমান, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? ইহারা প্রত্যকেই নিজ নিজ গুণ বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্নিহিত শক্তির দরুণ প্রত্যেকের তরে শুধু কমনীয়ই নয়, বরং ইহাদের পরস্পরের মিলন না হইলে ইহাদের সকল শক্তিই অর্থহীন হইয়া যায়। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কেও এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূফে প্রযোজ্য। আকাশ ও পৃথিবী, রাত ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আলো ও অন্ধকার-সমস্তই স্বামী-স্ত্রীর মত পরস্পর বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এক নিবিড় গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। এমনকি স্বামী-স্ত্রী যেমন একে অপরকে ছাড়া পুরাপুরি ব্যর্থ ও নিষ্ফল ঠিক তেমনি দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ ও উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উহার জুড়ির সংযোগ ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন অংশ ও উপাদানগুলির প্রত্যেকটিই উহার জুড়ির সংযোগ ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হইয়া পড়ে। স্বতন্ত্রভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে যেমন এই কথা সত্য, সামগ্রীকভাবে সারা বিশ্বজগত সম্পর্কেও এই কথা অনস্বীকার্য। দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুর অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পৃথিবীর এই বিরাট কারখানার অহর্নিশ একান্তভাবে কার্যনিরত হইয়া থাকা আবশ্যক। ধানের একটা চারা অংকুরিত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, যতক্ষণ না এই বিশ্ব-প্রকৃতির প্রয়োজনীয় সমগ্র উপাদানগুলি উহার লালন-পালন, রক্ষাণাবেক্ষণ ও পরিবর্ধনের কাজে নিজ নিজ শক্তি পরিপূর্ণরূপে নিযুক্ত করে। মাটি দেয় দাঁড়াইবার আশ্রয় ও শিকড় ছড়াইবার জন্য বিস্তৃত ভূমি, বৃষ্টি দান করে

পানির অংশ, সূর্য তাপ দিয়া উহাকে উত্তাপ্ত রাখে, শিশির দেয় শীতলতা, বাতাস দেয় কোমল স্নেহের স্পর্শ। এই সবকিছুই যখন একটা বিশেষ নিয়ম-শৃংখলা ও পরিমাণের সমতার সহিত নিযুক্ত হয়, তখনি ধানের একটা গাছ এবং উহার শীর্ষে সোনালী বর্ণের শত শত কণা সমন্বিত কয়েকটি ছড়া সৃষ্টি হইতে পারে-তাহার পূর্বে নয়। পরন্তু এই অপরিহার্য জিনিসগুলির কোন একটির পরিমাণ একটু বেশী বা কম হইলেই সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাওয়া অবশ্যম্ভবী।

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতির সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ কি আপনা-আপনিই হইতেছে? না ইহার পশ্চাতে আছে কোন শক্তিমান সুব্যবস্থাপক সত্তা-যিনি এই বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করেন এবং উহাকে এমনি করিয়া একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে পরিচালিত করেন?

এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তমূলক কথা এই যে, কোন মানুষের মনই একথা স্বীকার করিতে পারে না যে, এই সব কোন সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে। দুনিয়ার ছোট বড় যে কোন জিনিস সম্পর্কেই আমরা কল্পনা করি না কেন, আমরা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না যে, তাহা নিজে নিজেই অস্তিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, এই দুনিয়ার সৃষ্টি একটা আকস্কিক ঘটনামাত্র, নিজে নিজেই ইহা অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে এবং কোন ব্যবস্থাপক ব্যতিরেকে উহার বিভিন্ন উপাদানে ক্রমবিকাশ ঘটিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধনও কি একটা আকস্কিক ব্যাপার? মাটিতে একটা বীজ বপন করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদানগুলি মিলিত হইয়া একটা গাছ সৃষ্টি করার কাজে উহাকে কেন সাহায্য করিবে? মায়ের গর্ভে এক ফোটা শুক্র প্রবিষ্ট হইয়া কেন সৃষ্টি করিবে হাড়-মাংস অস্থিমজ্জা বিশিষ্ট একটা সুঠাম সুগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ অবয়ব বিশিষ্ট মানব দেহ? কোন বুদ্ধিমান মানুষই কি একথা বিশ্বাস করিতে পারে যে, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, পাখী, মানুষ ও পশু সব কিছুই একটা দুর্ঘটনার মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে? নিজ থেকেই প্রত্যেকটির ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছে? তাহার পর একেবারে আকস্কিকভাবেই তাহাদের মধ্যে এই বিস্ময়কর মিলন ও সংযোগ ঘটিয়াছে? তাহার পর একেবারে আকস্কিভাবে ইহার সমস্তই মানুষের জন্য কেবল উপকারীই নয়, একান্ত সেবক হইয়া পড়িয়াছে; মানুষের বুদ্ধি এই ধরনের অস্বাভাবিক দুর্ঘটনাকে কোন ক্রমেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। কোন মানুষই এমন একটা দোকানের কল্পনা করিতে পারে না সেখানে বেচা-কেনা রীতিমতই চলিতেছে, মূল্য দেওয়া নেওয়াও যথাযথরূপে সম্পাদিত হইতেছে, এক জিনিস বিক্রয় হইয়া সেখানে আসিয়া ভর্তি হইতেছে আরও অনেক নূতন নূতন দ্রব্যসম্ভার, অথচ দোকানদার সেখানে কেহই নাই। বর্তমানে

এমন কোন আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও উহার অন্তরালে উহার পরিচালক একজন নিশ্চয়ই থাকিবে, তাছাড়া সেই যন্ত্র চলাও কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

বিশ্ব প্রকৃতির কোণে কোণে প্রতি পরতে পরতে আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই এক সুদৃঢ়, মজবুত ও সর্বব্যাপী নিয়মশৃংখলা। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় এই দুনিয়া বহু ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের কেন্দ্রভূমি, অন্যদিকে আমরা দেখিতে পাই এহেন ভিন্ন ভিন্ন জিনিসগুলির পারস্পরিক এই কঠিন সংঘর্ষের মধ্যে ছোট বড় সমস্ত জিনিস যে কেবল বাঁচিয়া ও দাঁড়াইয়াহ আছে তাহা নয়, বরং সৃষ্টি জগতের বাড়িতেছে, ক্রমবিকশিত হইতেছে। একদিকে মনে হয় বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু এবং শক্তিই সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীনভাবে নিজ নিজ গন্তব্য পথে তীব্র অগ্রসর হইতেছে। ইহার কোন একটিও যে কোন সুদৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করিতেছে কিংবা ইহা যে কোন উচ্চতর শক্তির অধীন ও অনুগত হইয়া চলিতেছে, স্থুলদৃষ্টিতে তাহা মোটেই গোচরীভূত হয় না।

এইভাবে সৌরজগত সম্পর্কে যখন আমরা সুক্ষ্মদৃষ্টিতে চিন্তাকরি, কিংবা কোন অণুবিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, এক একটা বিরাট গ্রহ বিশেষ একটা দিকে তীব্র গতিতে হু হু করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। অনেক সময় এমনও হইয়া থাকে যে, এক একটি গ্রহ যদি মাত্রই না থামিয়া একেবারে উদ্দাম গতিতে কেবল সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, তবে এই পৃথিবীর সাথে উহার সংঘর্ষে অবশ্যম্ভাবী এবং উহার ফলে এই মাটির পৃথিবীর সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ ও টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়া একান্তভাবে অবাধারিত। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ফলেই অনেক জ্যোতির্বিদ সময় সময় ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, এত দিনের মধ্যে অমূক গ্রহটির সহিত এই পৃথিবীর সংঘর্ষ হইবে। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময় ভিন্ন এক দিকে ছুটিতে শুরু করিয়াছে- যেমন কোন সুদক্ষ সহিস তীব্র গতিতে ছোট ঘোড়ার লাগাম কশিয়া ঘুরাইয়া দেয় অন্য আর একদিকে। ফলে এই দুনিয়া আসন্ন ও অবধারিত এক কঠিন বিপদের হাত হইতে রেহাই পাইয়া যায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

কিন্তু ঘোড়ার মতো উদ্দাম গতিতে ছোটা শূন্যমার্গের এই অসংখ্যা গ্রহের সহিস কে? পরিচালক কে? কে এই- গুলির লাগাম দৃড় মুষ্টিতে টানিয়া ধরিয়াছে এবং নির্দিষ্ট একটি সীমা পর্যন্ত উহাকে ছুটিয়া যাইতে দিয়া পুনরায় যখন ইচ্ছা এমনভাবে কশিয় ধরিতেছে যে, তাহার পরে উহার কোন একটিও নিজ ইচ্ছামত এক ইঞ্চি পরিমাণও অগ্রসর হইতে পারে না? ইহা কি শুধুই দুর্ঘটনা শুধুই স্বভাবের নিয়ম? ইহা কি অন্ধ ও জড়গ্রহগুলির নিজ নিজ ইচ্ছাক্রমেই সংঘটিত হইতেছে? না, তাহা হইতে পারে না। মানুষের মন জ্ঞান-বিবেক তারস্বরে ঘোষণা করে-আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যকে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি-নিয়মের কঠিন মুষ্ঠিত ধারণ করিয়া আছেন।

আল্লাহ্ আকাশ রাজ্যকে এতদূর দৃঢ় নিয়মে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত উহার একটির উপর অন্য আর একটি আসিয়া পড়িতে ও কোনরূপ সংঘর্ষ বাঁধাইতে পারে না।

চারিদিকে এই জগতের বুকে আমরা এই সব বিষয়ে বাস্তবভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া যখন আমরা বিশ্ব জগতের নৈতিক গ্রহগুলির গতিবিধি ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ গবেষণা করি, সেখানেও আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই উক্ত নীতিরই বাস্তব কার্যকরিতা।

নৈতিক জগতে একটা ভুল নীতি ও বাতিল মতবাদের সৃষ্টি হয়। আর সেই সঙ্গে জন্ম হয় সেই নীতি ও মতবাদের প্রচারক এবং উহার নিশানবর্দার। তাহার পর তাহাতে গঠিত হয় একটা বাতিল চরিত্র নীতি, একটা বাতিল অর্থ-ব্যবস্থা এবং ভুল রাষ্ট্রপতি। এমন কি এই বাতিল নীতিগুলির জয়জয়কার দেখিয়া অনেক সময় মনে হয় সত্য-মত ও সত্য-নীতির আওয়াজ বুঝি বাতিলের উচ্চকিত কলকোলাহলে ক্ষীণ ওস্তব্ধ হইয়া যাইবে, সত্যের পতাকা বুঝি এবার চিরদিনের তরে ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে। তারপরে সেই বাতিল নীতি ও ভুল আদর্শ এক মহা অবকাশ পাইয়া বসে এবং সেই অবকাশে সে তাহার বিষাক্ত জীবাণু সমগ্র জল স্থলের প্রতি পরতে পরতে ছড়াইয়া দেয়। এই সংকটময় মুহূর্তে সত্যের পতাকাবাহীগণ পূর্ণমাত্রার নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, ব্যর্থতার আঘাতে সত্যের সেই সৈনিকদের আত্ম ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যায়। কিন্তু সহসা সেই নি:সীম অন্ধকারের বক্ষ দীর্ণ করিয়া নতুন সূর্যের উদয় হয়, কোন এক অদৃশ্য হস্ত আকস্কিভাবে সকল লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সেই বাতিল নীতি ও আদর্শকে পরাজিত করে, উহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং তার অফুরন্ত সাহায্যে সত্যের বিজয়ডংকা নতুন করিয়া বাজিয়া উঠে। সত্য-নীতি ও আদর্শ পৃথিবীর বুকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথা প্রত্যক্ষ করিয়া জানিবার পর কোন মানুষকি এক মুহূর্তের তরেও বিশ্বাস করিতে পারে যে, এই দুনিয়া নিজস্বভাবে ও স্বীয় একক ক্ষমতার বলে কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া-ই অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে এবং নিজেরই শক্তির বলে ইহা দাঁড়াইয়া আছে? কেহ কি মনে করিতে পারে যে, এই দুনিয়া কতগুলি বিভিন্ন প্রকারে মৌল উপাদান ও বস্তুর একটা সমষ্টি মাত্র এবং ইহা কোন উচ্চতর শক্তির কঠিন মুষ্টিতে আবদ্ধ নয়? পরিচালিত নয় কোন মহাশক্তিমান সত্তার নিয়ন্ত্রণে?

কাজেই এই কথা অনস্বীকার্যরূপে প্রমাণীত হইয়া যাইতেছে যে, এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে এক বুদ্ধিমান ও পরাক্রমশালী মহান সত্তা বর্তমান, যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং যিনি জ্ঞান, শক্তি, প্রতিপালন, ক্ষমতা ও প্রতিকার স্বত:স্ফুর্ত গুণ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত ও বিভূষিত। তিনিই নিজ জ্ঞান ও সৃজনী প্রতিভার দ্বারা জড়জগতের

বিভিন্ন উপাদানগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় সংযোগ, সামঞ্জস্য ও মিলন সৃষ্টি করিতেছেন এবং সেইগুলির সমগ্র ভাবে একটা সুনির্দিষ্ট ও কল্যাণময় উদ্দেশ্যেসাধন করিবার জন্য ব্যবহার করিতেছেন।

এইখানে এ কথারও সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত এবং এই আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বহু নয়-একটি মাত্র সত্তাই বর্তমান, যিনি সৃষ্টিকর্তা, মালিক, যিনি নিজ ইচ্ছামত ইহার ব্যবহার ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যকোন ইচ্ছা তাঁহার শরীক নাই-অংশীদার বা সাহায্যকারী নাই। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ ও উপাদানগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া যখন সেইগুলির সংযোগ সৃষ্ট এই সুন্দর সুরূপ ঐক্য অর্থ্যাৎ সমষ্টিগত দুনিয়ার রূপ ও সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করি, তখন ঠিক এই তত্ত্বই আমাদের সম্মুখে উদঘটিত হয় যে, এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক মাত্র একজন সুরুচি সম্পন্ন এবং সুদক্ষ ককরিগরের দুষ্টান্তহীন শিল্প সৃষ্টির ফলশ্রুতি। উহার বিভিন্ন অংগ ও অংশের গঠন রূপদান যদি বিভিন্ন কারিগরের বিভিন্ন ইচ্ছা অনুসারে সাধিত ও বিকশিত হইতে পারিত না। এইভাবে সমগ্র দুনিয়ার সমষ্টিগত রূপও যখন কোন মানুষ প্রত্যক্ষ করি, তখন সে নিশ্চিতরূপে এই সিদ্ধান্তই করিত বাধ্য হয় যে, চারিদিকে বিস্তৃত পৃথিবীর এই চাকচিক্য ও মনোহর শোভা সৌন্দর্য একটি মাত্র পছন্দেরই স্বেচ্ছামূলক অভিব্যক্তি। যদি বহুবিধ ইচ্ছা ও রুচি তাহাতে কাজ করিয়া থাকিত এবং এই দুনিয়া বহু বিভিন্ন দেবতার লীলাক্ষেত্র হইত তবে প্রথম : উহার অস্তিত্ব ও স্থিতিই হইত সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। আর তা স্থায়ী হইত বলিয়া যদি ধরিয়াও লওয়া যায় তবুও ইহা এমনি রকমের এক সুসজ্জিত সুবিন্যাস্ত ও সুশৃঙ্ক্ষলিত সভামন্ডুপ কিছুতেই হইতে পারিত না; হইত একটা প্রকান্ড ও অসংবৃত গুদামঘর। এবং উহাকে আজ একটা সুন্দর ও অজস্র শোভার পরিপূর্ণ নিখুঁত ঐক্য হিসাবে না দেখিয়া আমরা উহাকে দেখিতে পাইতাম একটা ভয়ানক ও বিকট আকৃতির বীভৎস জিনিসরূপে। কারণ বিভিন্ন স্বাধীন নিরুংকুশ ইচ্ছার সংঘর্ষে কোন সুশৃংখলা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিস সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

উপরন্তু আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপক ও পরিচালক যদি ভিন্ন ভিন্ন হইত, কিংবা যদি ইহা অসংখ্যা রুচি ও ইচ্ছার লীলাক্ষেত্র হইত, অথবা ভাল ও মন্দ, আলো ও অন্ধকার সৃষ্টিকর্তা যদি আলাদা হইত, তাহা হইলে বিশ্ব-ভূবনের এই বিপুল ও বিভিন্ন অংশ-উপাদানের মধ্যে এইরূপ নিবিড় ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকিতে পারিত না বরং ইহার একটার সাথে অন্যটার সংঘর্ষে সৃষ্টিজগত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত। বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্য দেখিতে পাইয়া যদি কেহ মনে করিয়া থাকে যে, ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর রুচি বা ইচ্ছা অনুসারে সৃষ্টি হইয়াছে, তবে তাহারা ভ্রান্ত ও প্রতারিত। কারণ স্থুল, নিতান্তই বাহ্যিক বিরোধ মাত্র! ইহার অন্তপ্রদেশে রহিয়াছে পূর্ণমাত্রার সাদৃশ্য সাযূয্য।

সৃষ্টি জগতের মধ্যে আর একটি রহস্য আছে, তাহা বিপরীত জিনিসের দ্বারা বিপরীত জিনিসের সৃষ্টি। সবুজ কাঁচা গাছ থেকে অগ্নিফূলিংগ নির্গত হওয়া, নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ হতে প্রাণীর সৃষ্টি-কী এক অদ্ভূত ব্যাপার নয়? বিজ্ঞানের কার্যকরণ পরম্পরা-তত্ত্ব এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিথ্যা, একেবারেই ভূয়া বলিয়া মনে হয়। বিশ্ব-প্রকৃতিকে যাহারা নিছক কার্যকরণ পরম্পরার অন্ধ-নিয়মের অনিবার্য ফলশ্রুতি বলিয়া মনে করে, তাহারা এখানে সম্পূর্ণরূপে কুপোকাত। উপরুন্ত একই প্রকারের উপাদানের দ্বারা অসংখ্য স্ববিরোধী ও বিচিত্র জিনিসের সৃষ্টিকেও কি সামান্য ব্যাপার বলিয়া মনে করা যায়? একই মাটি, একই নিয়মে প্রবাহিত বায়ু, বৃষ্টি, শিশিরও এক, কিন্তু সংমিশ্রণে সৃষ্টি হইল যে উদ্ভিদ হইল কত বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন প্রকৃতির ও কত বিচিত্র। একই পিতার ঔরষে একই মায়ের গর্ভে জন্ম হইল কত বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন চরিত্রের এবং বিভিন্ন লিংগের সন্তান।

কত বিচিত্র ফুল আছে এই পৃথিবীতে, তাহা হিসাব করিবে কে? বৃক্ষরাজির পাতার ও ফলের আকার-আকৃতি, উহার পরিমাণ, রং, স্বাদ ও গন্ধ-সবই বিরোধী। কিন্তু সেসব বিরোধ একেবারেই বাহ্যিক। তাহাতে বিভিন্ন ইচ্ছা শক্তির কার্যকরিতা আছে বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। উপরন্তু বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্যিকরূপ ও সৌন্দর্য বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সংমিশ্রণ, দ্বন্দমূলক সৃষ্টিধারা এবং একই প্রকারের উপাদানের দ্বারা বিভিন্ন জিনিসের সৃষ্টি-এই সব কিছু দ্বারাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে, এই দুনিয়া কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে অস্তিত্ব লাভ করে নাই এবং বিভিন্ন দেবদেবীর কীর্তিও ইহা নয়। স্থূলদর্শী মানুষ সমুদ্রের বুকে উত্তাল তরঙ্গমালাই শুধু দেখিতে পায়, কিন্তু সেই উর্মিমালার অতলতলে যে শুক্তি এবং সে শুক্তির অভ্যন্তরে যে বহুমূল্য মুক্তা, সে পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি মাত্রই পৌঁছাতে পারে না। লোনা জলের সমুদ্র এবং মিঠা পানির দরিয়ায় বাহ্যত: কতই না প্রভেদ; কিন্তু ভাবিবার বিষয় এর উভয় প্রকারের নদী দ্বারা কেমন করিয়া একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। মানুষ এই উভয় প্রকারের পানি দ্বারা নিজেদের খাদ্য, নিজেদের অলংকার ও সম্পদ অর্জন করিতেছে। জাহাজ পরিচালনা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজ উভয়ের উপর দিয়া সমানভাবে কত সহজেই না সাধিত হইতেছে। রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো, চন্দ্র ও সুর্য সম্পর্কে চিন্তা করিণলেও দেখা যায় ইহারা নিজ নিজ গরিমা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া কতই না পরস্পর বিরোধী, কিন্তু তাহা সত্বেও ইহারা কত একাগ্রতা ও সামঞ্জস্যের সহিত বিশ্ব-প্রকৃতি এবং উহার আধিবাসী উদ্ভিদ পশু ও মানুষের অবিশ্রান্ত খেদমত করিতেছে। কাজেই আকাশ রাজ্যের দেবতা একজন এবং পৃথিবীর দেবতা আর একজন কিংবা বৃষ্টিপাত হয় একজনের ইংগিতে, বৃক্ষরাজিতে ফল ধরে অন্য দেবতার ইচ্ছায়-ধারাণা করার মূলে কোনই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বর্তমান নাই,

থাকিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে-অসংখ্যা প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সংযোগ সৃষ্টি হইয়া একজন এককেন্দ্রিক প্রভু ও সম্রাট ব্যতীত এই দুনিয়া পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বর্তমান রহিল কেমন করিয়া? এই পৃথিবীতে বিভিন্ন শক্তির ও বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সংঘর্ষে নিরন্তর লাগিয়াই আছে, বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী জিনিসের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম অবিরাম চলিতেছে; কিন্তু দুনিয়ার এই পান্সী নৌকা এই উত্তাল তরঙ্গমালার ঊর্দ্ধে থাকিয়া সামলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া, আছাড়া পড়িয়া আবার উঠিয়া সম্মুখের দিকে কেবল চলিতেছে আর চলিতেছে। একমাত্র প্রভূর সুদৃঢ় প্রভুত্ব কার্যকর হইয়া না থাকিলে কবে যে ইহা চূর্ণ বিচূর্ণ ও বিস্মৃতির অতল দরিয়ায় ডুবিয়া যাইত তাহার কোন ঠিকানাই ছিল না।

নিখিল-প্রকৃতির এবং সমগ্র জীব-জন্তু ও বস্তু জড় হইতে উদ্ভূত, কোন সষ্ট্রা নাই, কোন ব্যবস্থাপক নাই-বর্তমান কালের এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের ইহা এক বলিষ্ঠ মত। উপরন্তু তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বিশ্ব-সৃষ্টি সম্পর্কে ইহাই হইতেছে সর্বশেষ কথা। কিন্তু এই বলিষ্ঠ মতের গোড়ায় যে কতখানি দুর্বলতা ও অযৌক্তিকতার নির্লজ্জতা নিহিত রহিয়াছে তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলেই প্রকট হইয়া পড়ে।

জড় সম্পর্কে প্রাচীন মত এই যে, দুনিয়ার যে সব নতুন সংঘঠিত ঘটনার আবর্তন আমরা অনুভব করিয়া থাকি তাহা সবই অননূভুত পরমাণু কীর্তি। চেতনা ও মন জড়েরই ক্রিয়া, জড় নিছক একটা পদার্থ বিশেষ, বাকী সমস্ত তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র।

বস্তুত জীবন ও চৈতন্যের যান্ত্রিক বা জড়ীয় পন্থায় বিশ্লেষণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। মানবদেহের সমস্ত গুরূত্বপূর্ণ কার্যাবলী যথা রক্তের প্রবাহ, হজম, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভূতি বর্ধিষ্ণু দেহেরই পরিচায়ক ও পরিপোষক। পদার্থ বিজ্ঞান কিংবা রাসায়নিক পন্থায় ইহার বিশ্লেষণ করা যায় না। কারণ তাহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বে কোন প্লান রচনাবলী ছাড়া অ-মন হইতে মন এর সৃষ্টি হইল কিরূপে? নির্জীব ও অচেতন জড় হইতে জীবনের উদগম হইল কেমন করিয়া? জীবন, মন ও চেতনা কি নিজেই সৃষ্টি হইয়াছে? তাহা হওয়া কি কোন প্রকারেই সম্ভব?

বস্তুত: গোড়াতেই এক সৃষ্টিকর্তা ও এক ব্যাবস্থাপক স্বীকার না করিয়া লইলে জীবনের বিশ্লেষণ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। তিনিই জড়ের মধ্যে এক বিরাট ও অপূর্ব ক্ষমতা দান করিয়াছেন, তিনিই সেই জড়কে বিবর্তিত ও বিকশিত করিতেছেন। প্রকৃতির যদি শৃংখলা না থাকিত, তবে না দুনিয়া হইতে পারিত, না জীবন। এই শৃংখলাকে কায়েম রাখিয়াছেন বিশ্ব-প্রকৃতির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও ক্রমবিকাশদাতা আল্লাহ তাআলা।

যন্ত্র-বিজ্ঞান জীবনকে শুধু জড়ের সাহায্যেই বুঝিতে চায়; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং বিজ্ঞানই জড়ের তত্ত্ব ও এত সুন্দর ও সুস্পষ্ট করিয়া বিশ্লেষিত করিয়াছে যে, তাহা আল্লাহ তাআলারই প্রবল ও দুর্লংঘ নিয়ম শৃংখলার অধীনে বিলীন এবং কঠিন দাসত্বের নিগড়ে

বন্দী। উহা এই দুনিয়ার প্রভুত্ব, মালিকত্ব ও সৃষ্টি-শক্তির বিন্দুমাত্র অধিকারী নয়। এই সবের অন্তরালে আল্লাহ তাআলাই হইতেছেন ইহাদের সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং এই সকলের উপর তিনিই একমাত্র ও একচ্ছত্র প্রভু। বিশ্ব-ভূবনের প্রতিটি অণূ-পরমাণু সমানভাবে সেই একমাত্র আল্লাহ তাআলারই একান্ত দাস। অতএব-

হে মানুষ! তোমরা সেই মহান প্রভূর দাসত্ব কবুল করা যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববতী লোকদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে সম্ভবত: তোমরা (তাঁহার আজাব হইতে) বাঁচিতে পারিবে। তিনি তোমাদের জন্য মাটির শয্যা এবং আকাশের ছাদ তৈয়ার কিরয়াছেন। ঊর্ধ্বে হইতে বৃষ্টিপাত করিয়াছেন। অতএব তোমরা জানিয়া শুনিয়া এক আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কেহ শরীক আছে বলিয়া মনে করিও না।

মানব প্রকৃতি ও তাওহীদ

আলাদাভাবে প্রত্যেকটি মানুষের এবং সমগ্রভাবে গোটা মানব জাতির মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিলে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষের গভীর মনে এক দয়াময় প্রভুর তীব্র চবেতনা বিদ্যামান। বস্তুত: মানব-প্রকৃতিতে এই চেতনাই হইতেছে সবচেয়ে আদিম ও সমদিক সুস্পষ্ট এবং সর্বাধিক শক্তিশালী। এই চেতনা মানুষের সমগ্র মনোরাজ্যকে, তাহার সমস্ত স্নায়ূমন্ডলীকে সর্বোতভাবে গ্রাস করিয়া আছে। ঠিক এই কারণেই আদিম মানব সেই প্রথম থেকেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁহার বিপুল শক্তি ও ঐশ্বর্যের অবদান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে এবং নিজেকে তাঁর নিকট পরিপূর্ণরূপে সোপর্দ করিয়া দিতে বিশেষ ভাবে ব্যাগ্র-ব্যাকুল হইয়া পরিয়াছিল। অতএব এক সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করার ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসের মতই আদিম ও দীর্ঘ। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মানুষের ধারণা বস্তুজগতের মত ক্রমশ: বিবর্তিত হইয়া বহুত্ববাদ হইতে একত্ববাদ হইতে একত্ববাদ আসিয়া পরিণত হইয়াছে-আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভূল ও প্রতারণাময়, সন্দেহ নাই।

মানুষ নিজের সম্পর্ক চেতনা লাভ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছে। তাহার দেহের অভ্যন্তরে প্রভূত শক্তি ও বহুবিদ গুণ-গরিমার বিপুল সমাবেশ আর বাহির পৃথিবীতে দেখিতে পাইয়াছে কত অগণিত দ্রব্যসামগ্রী তাহার সুখ-সম্ভোগ বিধানের জন্য নিরন্তর প্রস্তুত ও মহাকর্মে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন সে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় দয়া-অনুগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে এবং তাহাকে ভালবাসিয়াছে তেমনি উহার পরই সেই সৃষ্টিকর্তার রুদ্র কঠিন বৈশিষ্ট্যের কথা জানিতে পারিয়া তাহার প্রাপ্ত এই সব সম্পদ হারাইবার আতংকে ভীত-শংকিত হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব এক সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করার ইতাহাস মানবজাতির ইতিহাসের মতই আদিম ও দীর্ঘ। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মানুষের ধারণা বস্তুজগতের মত ক্রমশ: বিবর্তিত হইয়া বহুত্ববাদ হইতে একত্ববাদে আসিয়া পরিণত হইয়াছে-আধুনিক বিজ্ঞানীদের এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভূল ও প্রতারণাময়, সন্দেহ নাই।

মানুষ নিজের সম্পর্কে চেতনা লাভ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছে, তাহার দেহের অভ্যন্তরে প্রভূত শক্তি ও বহুবিদ গুণ-গরিমার বিপুল সমাবেশ আর বাহির পৃথিবীতে দেখিতে পাইযাছে কত অগনিত দ্রব্যসামগ্রী তাহার সুখ-সম্ভোগ বিধানের জন্য নিরন্তর প্রস্তুত ও মহাকর্মে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন সে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় দয়া-অনুগ্রহ দেখিয়া মুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহাকে ভালবাসিয়েছে তেমনি উহার পরই সেই সৃষ্টিকর্তার রুদ্র কঠিন বৈশিষ্ট্যের কথা জানিতে পারিয়া তাহার প্রাপ্ত এই সম্পদ হারাইবার যে, যে আল্লাহ তাআলা দয়া করিয়া তাহাকে এত কিছু দিয়াছেন, সেই আল্লাহ তাআলাই তাঁর নিজ ইচ্ছামত ও নিজ শক্তির বলে আবার এই সব কাড়িয়া লইতে পারেন। এই জন্যই মানুষ একদিকে তাহার প্রাপ্ত সম্পদগুলির সংরক্ষণ ও আরো অধিক প্রাপ্তির আশায় আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করিবার জন্য এবং অন্যদিকে সেই সম্পদ হারাইবার ভয়ে খোদার নিষিদ্ধ কাজকর্ম হইতে বিরত থাকিবার জন্য অধিক আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িল। ইহা হইতেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, প্রকৃতির বিকট রূপ দেখিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াই মানুষ সর্ব প্রথম বিধাতার পূজা করিতে শুরু করে নাই। বরং তাহার পূর্বে প্রাপ্ত সম্পদের ভিতর দিয়া সৃষ্টি কর্তার দিকে মানুষ কৃতজ্ঞতায় একান্তভাবে বিনয়বনত হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ধারণার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট।

দানের কথা চিন্তা করিলেই জাগে দাতার সম্পর্কে চেতনা। আর এই দান ও দাতার সন্দেহতিত প্রত্যয়ই মানুষের মনে জাগাইয়া তোলে দাতার প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা এবং তাঁহার আনুগত্য করার উদ্দম ভাবাবেগ। ইহা শুধুমাত্র অভ্যাসের সৃষ্টি নয় আর কেবল তামদ্দুনিক জীবন যাপনের ফলও ইহা নয়। এই ভাবধারা আমরা অনেক সময় বন্য পশুর মধ্যেও পর্ত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিতে এই ভাব বর্তমান পাওয়া যায়

সবচেয়ে উত্তম স্বত:স্ফূর্ত ও উন্নতরূপে। এই ভাবাবেগই মানুষের প্রকৃতিতে জন্ম দিয়াছে এক অটল-অমোঘ ইনসাফের নিদারুণ স্বীকৃতি। তাই আজ মানুষের জন্য ওজন করা হয় যে দাড়িপাল্লায়, সেই মানুষ পরের জন্য মাপে ঠিক সেই বাটখাঁরা দিয়া। ইনাসাফের এই তীব্র অনুপ্রেরণাই খালেছে আস্তক্যবাদ এবং তাওহীদের সুদৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপিত করিয়াছে। নিখিল মানুষের হৃদয়-মন তাই সেই এক এর সন্ধ্যানেই সন্থন করিয়াছে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাহীন সমূদ্র। মানুষের প্রকৃতিগত এই ইনসাফ একদিকে দাবি করে যে, সৃষ্টিকর্তার সমস্ত গুণ ও অধিকারকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আর তাঁহার সে সব অধিকার ও গুণকে স্বীকার করা হইবে, তাহাতে অন্য কাহাকেও অকারণ শরীকদার মনে করা হইবে না। অন্যথায় ইহা একটা মস্তবড় জুলুম ও পরের অধিকার নষ্ট করার একটা ভয়ানক অপরাধ হইবে, সন্দেহ নাই।কাজেই এই কথা উদাত্তকণ্ঠে ষোষণা করা যাইতে পারে যে, বিশ্ব ভূবনের একমাত্র সত্য ও সবচেয়ে বড় ইনসাফ হইতেছে তাওহীদ (সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ) এবং সবচেয়ে বড় জুলুম হইতেছে শিরক (বহুত্ববাদ)। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির ব্যাপারে এবং মানুষের নিকট প্রাপ্য ইবাদত-উপাসনায় অন্য কাহাকেও শরীক করেন নাই। একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া অন্যের কাছে মাথা নত করার লাঞ্চনা হইতে মানুষকে রক্ষা করিয়াছেন। মানব জাতির প্রতি ইহা তাঁহার সমস্ত শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের মধ্যে অন্যতম। কারণ মানুষকে যদি দুনিয়ার সমস্ত বড় শক্তিমানের কাছে মাথা নত করিতে ইহত, ভয় ও উপাসনা করিত হইত, তাহা হইলে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি এই মানুষ জাতির একদিকে যেমন চরম অবমাননা হইত, অন্য দিকে তেমনি মানুষের জীবন ভরিয়া কেবল প্রত্যেক বড় জিনিসেরই পূজা করিতে হইত। তখন তাহার আবস্থা হইত মহল্লার এক সাধারণ চৌকিদাররের মত গ্রামের মোড়ল ও ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার চেয়ারম্যান হইতে শুরু করিয়া দেশের লাট-প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত প্রত্যেক অফিসারকেই বিনীত আদাব-আরজ করা। প্রত্যেকের হুকুম তালিম করা এবং প্রত্যেকের ধমক ও গালাগাল খাওয়াই হইতে তাহার জীবনের নিত্যকার কর্তব্য। অথবা তাহার অবস্থা হইত বৃন্তচ্যুত একটা ছিন্ন-শুকনা পাতার মত, হওয়ার সামান্য দোলা-ই তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইত এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, একদিকে হইতে অন্যদিকে। মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রহিয়াছে এই সুগভীর তত্বকথা। এই জন্যই মানব প্রকৃতি স্বাবাবত:ই ভালবাসে ও কামনা করে আঁধারের পরিবর্তে আলো, মুর্খতার বদলে সত্যজ্ঞান আর অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার স্থানে পরম স্থিরতা, নির্ভরতা ও স্বচ্ছদৃষ্টি। চারিদিকে বিস্তৃত এই বিশ্ব-ভূবন তাহার সম্মুখে একটা বিরাট রহস্য হইয়া থাকিবে, ইহার সুস্পষ্ট কোন সমাধান সে পাইবে না, ইহার শুরু ও শেষ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণাই তাহার থাকিবে না, একথা মানুষ কি করিয়া বরদাশত করিতে পারে? মানুষ নিজের অস্তিত্ব

ওজীবনের উদ্দেশ্যে সম্পর্ক তাহার ভাল-মন্দ ও পাপ-পূন্য সম্পর্কে সে একেবারেই বে-খবর থাকিবে-কিছুই জানিবেনা, বুঝিবেনা যে সে কোথা হইতে আসিয়াছে কোথায় যাইবে এবং এইখানে নিজের সাথে ও চারিপার্শ্বের এই কোটি কোটি মানুষের সাথে সে কি ধরণের ব্যবহার করিবে, কিরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিবে, ইহা একটা বড়ই অস্বাভাবিক ব্যাপার। মনব প্রকৃতি এই ধরণের অন্ধত্ব ও অজ্ঞতা কিছুতেই বরদাশত করিত পারে না। এই প্রকারের সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করা, তাহার সঠিক নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সমাধান সন্ধান করা এবং তাহার প্রত্যেকটা সম্পর্কে একটা না একটা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানব প্রকৃতির ঐকান্তিক দাবি। মানুষ এ বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া ও গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত না হইয়া কিছুতেই স্বস্তি পাইতে পারে না, ইহা মানব মনের অতি স্বাভাবিক পিপাসা, ইহার পরিতৃপ্তি অপরিহার্য! কিন্তু সেই পরিতৃপ্তি হইবে কেমন করিয়া?

এ প্রশ্নের প্রকৃত জওয়াব এই যে, মানুষ এক আল্লাহকে স্বীকার করিলেই এই উদগ্র পিপাসার নিবৃত্তি হইতে পারে। তাহা ছাড়া আর যাহাই সে করিবে, তাহাই হইবে ধাঁ ধাঁ-একটা মারাত্মক প্রতারণা। এই আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করিলেই মানুষের অশান্ত ও উচ্ছৃংখল মন স্থিরতা লাভ করিতে পারে, নিরবচ্ছিন্ন স্বস্তি ও আরামের নিশ্বাস ছাড়িতে পারে। বস্তুত তাওহীদ একটা আলো। এই আলো মানব হৃদয়ে প্রকটিত হইলেই সমগ্র সমস্যার সমাধান-সমস্ত প্রকারের জিজ্ঞাসার সুষ্ঠু জওয়াব সহজেই লাভ করা যায়। এই বিশাল প্রকৃতির বুকে মানুষ তাহার নিজের অস্তিত্ব ওঅবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করিতে পারে, এখানে তাহাকে কি করিতে হইবে, মানব সমাজের অসংখ্যা পদের মাঝে সে কোন পথ গ্রহণ করিবে আর কোন পথ বর্জন করিবে তাহা সে অতি সহজেই নির্ধারণ করিতে পারে। ইহা দ্বারাই তাহার চারিত্রিক আদর্শ, অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও সমাজ-পদ্ধতি অতীব সহজ ও প্রাঞ্জল হইয়া যায়।

এই উপায়ে মানব জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান পাইয়াও যাহার নিছক সন্দেহ ও অমূলক অবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহাকে কার্যকরভাবে গ্রহণ করে না, তাহারা মানব জাতির কুলাংগার। অবজ্ঞা ও সন্দেহবাদ মনোরাজ্যের একটা মারাত্মক রোগ, ইহা মানুষের মন ও প্রকৃতিগত স্বাস্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই রোগ যত শিঘ্র দূর হয়, মানব মনের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে ততই মঙ্গল। মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং তাঁহার একত্ববাদ সম্পর্কে যে দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানুষ তাহার নিজের ভিতর হইতেও পায়, বাহির প্রকৃতি হইতেও পায়। তাঁহাকে ছাড়া এই বিশ্ব-ভূবনের এবং তাহার নিজের অস্তিত্বের এই বিরাট রহস্যের কোন মাধ্যমেই সে করিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁহার একত্ববাদ এবং সমগ্র মহান গুণ-বৈশিষ্ট্য তাঁহার গুণান্বিত হওয়ার ইহাও একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। আর এই প্রমাণ যে সত্য, এই সমাধান যে

একেবারে অকাট্য ও সন্দেহতীত তাহারও প্রমাণ এই যে, ইহা দ্বারা মানব মনের দুর্নিবার পিপাসা মেটে, তাহার অশান্ত মন স্বস্তি এবং স্বান্তনা লাভ করিতে পারে। কিন্তু সেই আল্লাহর এবং তাঁহার সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করিয়া কোন মানুষ যদি অন্য কাহাকেও প্রভু বলিয়া মান্য করে এবং তাহাকে আল্লাহর মর্যদা দান করে তবে ইহা তাহার চরমতম দুর্ভাগ্যের প্রমাণ ছাড়া আর কি হইতে পারে। সে চলন্ত ট্রেনের দরজাকে নিজের ঘরের দরজা মনে করিয়া বাহির আংগিনায় পা রাখিয়া তাহার নিজের এই মারাত্মক ভ্রন্তিরই প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে তাহার সমস্ত জীবন ভরিয়া।

মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আরো গবেষণা করিলে এই তত্ব লাভ করা যায় যে, মানুষ স্বাভাবত:ই অপমান, লাঞ্চনা আধোগতি, পরের আনুগত্য ও গোলামীকে ঘৃণা করে এবং নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্য লাভ করাকে একান্তভাবে কামনা করে। নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভার অপূর্ব কীর্তি দেখিতে পাইয়া মানুষ মনে করে এই বিশাল দুনিয়ায় তাহার সমতূল্য ও তাহার প্রতিদ্বন্ধি আর কেহই নাই। এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধের বড় মনস্তাত্বিক কারণ এই যে, মানুষ প্রকৃত পক্ষে আশরাফুল মাখলুকাত এই দুনিয়ার সে সৃষ্টিকর্তার খলীফা। মানুষ তাহার এই বিশিষ্টতা ও প্রতিনিধিত্বের প্রচন্ড অনুভূতি লইয়াই এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়াছে। তাহার এই পদ অনুসারে তাহার প্রকৃতিতে যদি এই শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা স্বতস্ফূর্ত হইয়া না থাকিত, তবে সে এই পদের মর্যদা রক্ষা করিতে পাই যে, মানুষ অনেক সময় খোদায়ীর দাবি করিয়া বসে। মানুষ কখনো নিজেকে নিজের জাতির, তথা সমস্ত মানুষের গর্দানের মালিক ও জান-মালের একচ্ছত্র সম্রাট মনে করিতে শুরু করে। আর দাস হওয়ার বদলে খোদা হইয়া আল্লাহরই সৃষ্ট এই ধরণীতে নিজের আইন জারী করার মাধ্যমে নিজেরই প্রভুত্ব কায়েম কারিতে উদ্যত হয়। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে যখন সে দিখিতে পায় যে, তাহার সেই এই সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতাকে তাহার জীবনের শুরু ও শেষ বাল্য ও বার্ধক্যের দুই পংগুতার বেড়াজাল দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, তখন আপনা আপনিই তাহার গর্বোন্নত মস্তক আবনমিত হইয়া আসে। তখন খোদায়ীর রাজ-তখত ছাড়িয়া সে দাসত্বের ধূলি মাটিতে নামিয়া আসে এবং নিখিলের কোটি মানুষের সারিতে সমান হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। তাহার যে ললাট কোনদিন কাহারও সম্মুখে নত হয় নাই, তাহাই এখন অবলুন্ঠিত হইয়া পড়ে এমন শক্তির কাছে, যিনি দুনিয়ার সমস্ত শক্তি যোগ্যতার একমাত্র উৎস এবং সমগ্র আকাশ ও ভূসমন্ডলের একমাত্র মালিক ও ব্যবস্থাপক। কাহাকেও আল্লাহ বা আল্লাহ বলিয়া মানিয়া লইবার আগ্রহ মানুষের প্রকৃতিতে আছে বলিয়াই যে সে আল্লাহকে স্বীকার করে তাহা নয়, তাহার নিজের প্রকৃতিই ত আল্লাহর জন্য সতত ব্যাকুল, কিন্তু সে নিজের অভ্যন্তরে বিপুল শক্তির সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার অক্ষমতা সসীমতাকেও প্রত্যক্ষ করে, তখন সে পরিষ্কার দেখিতে পায়, তাহার ধন-সম্পত্তি, ক্ষমতা ও রাজত্ব কোন

কিছুই তাহার নিজের নয়, সবই আল্লাহর দান, উপরন্তু প্রকৃতিক জগতের উপর তাহার কোনই হাত নাই। মানুষের প্রকৃতিতে শ্রেষ্টত্বের অনুভূতি এত তীব্র ও প্রচন্ড যে, অনেক সময় সে এই দিক দিয়া একেবারে অন্ধ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার এই অক্ষমতা ও অসহায়তা তাহার নিকট ধরা না পড়ে ততক্ষণ সে খোদায়ীর দাবি ত্যাগ করিতে মোটেই সম্মত হয় না।

মানুষ যখন পরমরূপে এক বিধাতাকে লাভ করে, তখন সে দুনিয়ার সব কিছুরই প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া নিজেকে একান্তভাবে তাঁহারই দরবারে উৎসর্গ করিয়া দেয়। তখন সে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে আশহাদুআল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু- اَشْهَدُ اَللهُ اِلٰهَ اِلاَّ اَللهُ - আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও মানি না। কিন্তু তখনো যদি কেহ অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় তবে তাহাকে সেই দ্বীন প্রকৃতির ভিখারীর মত মনে করা যাইতে পারে, যে একজনের কাছ থেকেই তাহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস পাওয়া সত্বেও মুঠি মুঠি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরে এবং নীচতার কদর্যতা এত সীমাহীন হইয়া যায় যে, তাহার অপেক্ষাও সর্বহারার নিকট ভিক্ষার হাত দরাজ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছিয়াই মানুষ পাহাড়, বৃক্ষ, নদী, হিংস্র জন্ত, সংসহার মূর্তি কিংবা বিশেষ গুণে ভূষিত একজন মানুষের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া তাহার পূজা করিতে, তাহার রচিত আইনকে নির্বিচারে পালন করিতে শুরু করে। বস্তুত: মানুষের মূল প্রকৃতি ইহা নয়, ইহা তাহার আসল প্রকৃতির চরমতম বিকৃতি। ভিক্ষুকদের সংখ্যা আজ অত্যন্ত বেশী হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, মানুষের মূল প্রকৃতিই হইতেছে ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মান অনুভূতি ও পর-নিপেক্ষতা। ঠিক সেইরূপ এক সৃষ্টিকর্তার সহিত শরীককারীদের সংখ্যা আজ গণনাতীত হওয়া সত্বও মানব-প্রকৃতির মূল সত্য যে তাওহীদ তাহা চিরকালই সূর্যের মত দেদীপ্যমান থাকিবে।

এক আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ওপ্রভুত্বকে অস্বীকার করার কোন উপাই মানুষের নাই, তাহার ভিতরে প্রচুর শক্তি-সামর্থ মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সে নিজের হৃদয়-মনে তীব্রভাবে অনুভব করে একটা দু:সহ রিক্ততা ও প্রচন্ড হাহাকার। এক আল্লাহকে স্বীকার না করিয়া সেই এক এর সমীপে নিজেকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া না দিয়া সে কিছুতেই স্বস্তি পাইতে পারে না। পরন্তু মানুষ যখন এক আল্লাহকে নিসংশয়ে কবুল করে তখন সে দুনিয়ার সমস্ত প্রকার বিশ্ব হইতে নিরপেক্ষ, মুক্ত ও সম্পূর্ণ আজাদ হইয়া যাইতে পারে। অতপর বিশ্ব-প্রকৃতির কোন বিরূপ, কোন ভয়ংকর রূদ্র মূর্তি, কোন অসাধারণ শক্তি এবং কোন মানুষের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা দেখিয়া সে কিছুমাত্র বিচলিত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয় না। ইহাদের কাহাকেও প্রভু বা সৃষ্টিকর্তারূপে গ্রহণ করিবার, কাহারো সামান্য তারিফ-প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করিবার কোনই আব্যশকতা সে মনে করে না। একমাত্র প্রভুর গোলামী করার

পরিবর্তে অসংখ্যা প্রভু, মালিক ও মনিবকে সে কিছুতেই স্বীকার হইতেছে আল্লাহ তাআলা। এবং সেজন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পাইবার যোগ্য একমাত্র তিনি-অন্য কেহ নয়।

মানব প্রকৃতিতে কেবল শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিরই বিদ্যমান নয়, তার সঙ্গেই আছে নিজের নিকৃষ্টতার ও অসহায়তার চেতনা। মানুষের ভিতরে বিপুল শক্তি আছে, প্রতিভা আছে, তাহা দ্বারা সে আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের গোপন শক্তি সম্পদগুলিকে আবিষ্কার করিয়াছে। দুর শূন্যলোকে সে নিজের সিংহাসন স্থাপিত করিয়াছে, পাহাড়ের বুক ভেদ করিয়াছে, সমুদ্রের উপর দিয়া অবলীলাক্রমে নিজের সিংহাসন স্থাপিত করিয়াছে, পহাড়ের বুক ভেদ করিয়াছে, সমুদ্রের উপর দিয়া অবলীক্রমে নিজের বিজয়রথ চালাইয়াছে, কিন্তু এই সব কিছু সত্ত্বেও সে নিজের অসাহয়তা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সে জানে যে, যেসব শক্তি ও প্রতিভার দৌলতে সে এই সব কীতিকলাপ করিতে পারিয়াছে, সে নিজে তার একটিরও সৃষ্টিকর্তা বা নিরুংকুশ মালিক নয়। তার ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর কোনটাই সে নিজে সৃষ্টি করে নাই, সকলই অন্যের দেওয়া। সে শুধু নিজের ভিতরের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিয়া সাধনা করিয়াছে মাত্র। এইভাবে প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষই নিজের জীবনের প্রত্যেকটা অধ্যায় ও কাজে এক আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রভুত্বকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারে।

দুনিয়ার বড় বড় খোদাদ্রোহী মানুষের প্রকৃতিতেও এই চেতনার জাগরণ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাওয়া যায়। যেসব দুর্দান্ত দাম্ভিক মানুষ বিজ্ঞানের মানুষ বিজ্ঞানের জোরে বিশ্ব-প্রকৃতিতে জয় করার গৌরব আল্লাহেক অস্বীকার করার স্পর্ধা করিয়াছিল, আল্লাহর এই দুনিয়াতে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করিয়া ও নিজের রচিত আইন জারী করিয়া অধিকার চর্চা করিয়াছিল, আজ আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা ও সাধনার অনিবার্য ব্যর্থতা। তাহাদের বিলীয়মান অবস্থা তাহাদের চোখে আংগুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে মনুষ্য জাতির নিস্করুণ অসহায়তা। তাহারাও ধীরে ধীরে এক আল্লাহ তাআলারই পরিপূর্ণ প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাওহীদের অনিবার্যতা নতুন করিয়া বুঝিবার অভিনব দিন আজ সমাগত।

وَفِيْ الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ -

পৃথিবীতে প্রতিবিন্দুতে, এবং হে মানুষ! তোমাদের মন ও প্রকৃতির মধ্যে এক আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা বিশ্ববাসীগণই বুঝিতে পারে, কিন্তু তোমরা কি তাহা দেখিতে পাওনা?

তাওহীদের দাবী

তাওহীদ বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক মাত্র গভীর ও মহা সত্য। একটা বিরাট বৃক্ষের সাথে ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। একটা বৃক্ষের মতই ইহার মূল শিকার বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের গভীর তলদেশে মজবুত গাঁথিয়া আছে। ইহার কাণ্ড উপরে প্রকাশমান, ইহার শাখা-প্রশাখা সুদূর ঊর্ধ্বলোকে বিস্তারিত-ইহা পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে নিখিল সৃষ্টিকে।

অতএব ইহার মূলকে স্বীকার করিলেই অব্যশম্ভাবীরূপে মানিয়া লইতে হয় ইহার কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাকে এবং ইহার পত্র-পল্লব ও ফলফূলকে। ইহার মূলকে স্বীকার করিয়া ইহার বাহ্যিক কোন অংশকে স্বীকার না করিলে বস্তুত: সেই মূলকেই করা হয় অস্বীকার। -স্বীকার করিয়াছি বলিয়া মনে হইলেও তাহাকে ভ্রম ও প্রতারণাই বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে ইহার মূলকে অস্বীকার করিলেই পরিস্কার অস্বীকার করা হয় ইহার সমগ্র সত্তাকে। ইহার মূল ও শাখা প্রশাখার পরস্পরের মধ্যে অবস্থিতির দিক দিয়া সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও মানব জীবনের বিশ্বাস ও কাজের ক্ষেত্রে উহাকে স্বীকার করার ব্যাপারে উহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। সূর্যকে স্বীকার করিলে অনিবার্য রূপে স্বীকার করিতে হয় উহার দিগন্তব্যাপী আলোক রশ্মিকে-মূলের সাথে ইহার শাখা প্রশাখা এত নিবিড় ভাবে জড়িত।

নির্দিষ্ট একটা গাছকে যখন আমরা স্বীকার করি, তখন উহার পাতা, উহার ফুল ফলকেও মনে প্রাণে অনিবার্য রূপে মানিয়া লইতে হয়। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট ফল পাইতে হইলে উহার বীজকে উপযুক্ত রোপন করিয়া উহার ধীরে ধীরে অংকুরিত হওয়া এবং ক্রমে একটা বিরাট ফলদায়ক মহীরূহে পরিণত হওয়ার অতি স্বাভাবিক পন্থাকেই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সেই ফল পাওয়ার জন্য কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। তাওহীদের দাবি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতরূপে বুঝিবার জন্য গোড়াতেই এই নিগূঢ় তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া অনুধাবন করা আবশ্যক।

তাওহীদ অর্থ সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ, নিখিল বিশ্ব-ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র হইতে শুরু করিয়া এই মাটির পৃথিবীর সর্বপ্রকার জীবজন্ত, বস্তু ও মানুষ এই সব কিছুকেই যে মহান শক্তিমান সত্তা সৃষ্টি করিয়াছেন-তিনি এক, তিনি একক এবং তিনিই হইতেছেন আল্লাহ তাআলা। তাঁহার একত্বের অনস্বীকার্য প্রমাণ আছে সৌরাজগতের সুবিন্যস্ত নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে, আছে এই ধূলির ধরণীর প্রতিটি অণুপরমাণুতে এবং আছে মানুষের দুর্জেয় রহস্যাবৃত প্রকৃতির মধ্যে। প্রত্যেক সুস্থ মস্তিস্কের মানুষই এই তত্ত্ব স্বীকার

করিতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সৃষ্টিকর্তা সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রথমবার সৃষ্টি করিয়া দিয়া তিনি কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন কিংবা ইহার পরিচালন ও প্রতিপালনের দায়িত্ব অন্য কাহারো উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি নিজে বিশ্রাম করিতেছেন? না সৃষ্টির আদি হইতে অজাতক ইহাকে একমাত্র তিনিই পরিচালিত করিয়াছেন, ক্রমবিকাশ এবং নিত্য-নব সৃষ্টির প্রকাশ ও লয় একমাত্র তাঁহারই ইংগীত হইতেছে? আর অনন্তকাল পর্যন্ত একমাত্র তাঁহারই সর্বব্যাপী প্রভুত্ব সমানভাবে বর্তমান থাকিবে?

প্রশ্নটি যতই জটিল হউক না কেন ইহার সুচিন্তিত ও প্রকৃত জওয়াব হইতেছে এই যে, সৃষ্টি জগত আদি হইতে আজ পর্যন্ত যখন একটি মাত্র নিয়ম পালন করিয়া চলিয়াছে, সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম আজ পর্যন্ত হয় নাই এবং সৃষ্টির এই বিরাট কারখানাটা কোন দিনই এক মুহূর্তের তরেও থামিয়া যায় নাই, তখন হইতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, ইহা এক মহাপরাক্রান্ত সৃষ্টিকর্তারই পরিচালনাধীন। এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র অধিকার ও সামর্থ্য কাহারো নাই।অতএব আল্লাহ তাআলাই যেমন নিখিল বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা; তেমনি ইহার পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, পরিচালক, জীবন ও মৃত্যুদানকারী এবং জীবিকা প্রদানকারীও যাহা কিছু পাইতেছি তাঁহারই নিকট হইতে পাইতেছি। জীবজন্ত, বৃক্ষরাজি ও মনষ্য জাতির জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারে, জীবিকা প্রদানের ব্যাপারে, আর পৃথিবীর পরিচালনার ব্যাপারে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কাহারো প্রভুত্ব ও হস্তক্ষেপ রহিয়াছে কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কাহারো শরীকদারী আছে বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা চরমরূপে ভ্রান্ত, বস্তুত; তাহারা সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ বিশ্বাসী নয়, তাহারা অংশীবাদী। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, তাহাদের এই বিশ্বাসের সত্যতার কোনই যুক্তি নাই: বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম ওব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহতিক জ্ঞান তাহাদের নাই।

জীব-জন্তুকে জীবিকা দান করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও নাই। তিনিই প্রয়োজনানুরূপ নিয়মিতভাবে নিখিল জীবরে রিজিক দান করিতেছেন। আবার যখন কাহারো জীবনের আয়ু ফুরাইয়া আসে তাঁহারই হুকুম মত তাহার মৃত্যু হয়। এই সব ব্যাপারে অন্য কোন শক্তি আল্লাহ তাআলার শরিক নাই। তাহাই যদি হয়, তবে মানুষের আশা করিবার প্রার্থনা এবং নির্ভর করিবার স্থান তিনি ছাড়া আর কোথাও থাকিতে পারে না। অতএব এই বিশ্ব-ভুবনে ভয় করিবার যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেহই নাই, কারণ কাহাকেও ভয় করিবার যতগুলি কারণ থাকিতে পারে, তাহা সবই সেই সৃষ্টিকর্তার মহান সত্তায় কেন্দ্রীভূত। এই জন্যই উপাসনা আরাধনা পাইবার অধিকারী একমাত্র তিনিই। দাসত্বও আনুগত্য একমাত্র তাঁহারই করিতে হইবে দুনিয়াতে মানুষ জীবন যাপন করিবে একমাত্র তাঁহারই দেওয়া জীবন-বিধান অনুযায়ী। তাঁহাকে ভয় করিয়া তাঁহার অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত থাকা মানুষের কর্তব্য। অন্য কাহাকেও তাঁহার প্রতিবিম্ব, কিংবা পুত্র,

কিংবা মানুষের আকৃতিতে খোদার প্রকাশ মনে করিয়া তাহার পূজা করা সৃষ্টিকর্তার অবমাননা। যে সৃষ্টিকর্তার সত্তা এত বিরাট, এত মহান এবং পবিত্র ও পরমানুখাপেক্ষীহীন! সেই তিনি-ই এই দুনিয়ার সামান্য জিনিসের মধ্যে আশ্রয় লইবেন কেন?

এই বিশ্ব-ভুবনের মালিক কে? ইহা মানব-মনের এক বিরাট জিজ্ঞাসা। কিন্তু যিনি নিজ ক্ষমতা বলে নিজ ইচ্ছামত ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ক্রমবিকাশ দান করিয়া চালাইয়া নিতেছেন, তিনি ছাড়া ইহার মালিক আর কে হইতে পারে? দুনিয়ার কোন অজ্ঞানতাপূর্ব ভূখন্ডের শুধু সন্ধান লাগাইয়াই যদি কেহ উহার মালিক হইতে পারে, একটা নতুন জিনিস শুধু আবিস্কার করার দাবিতেই যদি আবিষ্কারক উহার স্বত্বাধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে নিখিলের সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি ছাড়া ইহার মালিকানার অধিকারী আর কেহই হইতে পারে না। কেন দেব-দেবী কোন মানুষই এই পৃথিবীর কোন একটা জিনিসের একচ্ছত্র মালিকত্বের অধিকারী নয়। পৃথিবী, আকাশ-রাজ্যে এবং ইহার ভিতরের ধন দৌলত, জায়গা জমি, এমন কি মানুষের অংগ প্রত্যংগ, মন ও মস্তিক্স, সব কিছুই একমাত্র মালিক তিনিই। মানুষের কাছে এই প্রকৃত মালিকেরই নির্দেশ মত। পৃথিবী রাজ্যের উপর স্বয়ং মানুষের মন ও মস্তিষ্কের উপর জীবন ও রাষ্ট্রের উপর একমাত্র সেই রাজাধিরাজেরই আইন চলিত, তাঁহারই মর্জিমত মানুষ তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া এই দুনিয়ার তাঁহারই ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবে ইহা তাওহীদের বাস্তব দাবি।

আল্লাহ তাআলাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের সষ্টিকর্তা ও জীবনদাতা স্বীকার করিয়া এই পৃথিবীর উপর এবং ইহার শ্রেষ্ঠ অধিবাসী এই মানব জাতির উপর অন্য কাহারো মালিকত্ব, প্রভুত্ব ও অন্য কাহারো রচিত আইন জারি করা এক দু:সাহসিক জুলুম মানব প্রকৃতির এক অন্তনির্হিত ইনসাফ ইহা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারে না। মানুষ তাহারই মত আর একজন মানুষকে কিংবা দেব-দেবীকে, অথবা কোন জীব-জন্তুকে প্রভু বলিয়া, পূজা পাইবার অধিকারী বলিয়া এবং স্বয়ং মানব জীবনের বিপুল ক্ষেত্রের জন্য আইন রচয়িতা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। অন্য মানুষের নিরুংকুশ শাসনক্ষমতাকে সে নির্বিকার চিত্তে মানিয়া লইতে পারে না। ইহা মানব প্রকৃতি, উদ্দাম তেজবীর্যের ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের সম্পূর্ণ বিরোধী-তাওহীদের একেবারে বিপরিত।

সৃষ্টিকর্তার নিজস্ব কতগুলি গুণ আছে, আছে কতগুলি একচ্ছত্র অধিকার। সেই গুণ ও অধিকারগুলিকে মানব জীবনে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করা ও কাজের ভিতর দিয়া তাহাকে রূপায়ন করা তাওহীদের ঐকান্তিক দাবি। তাওহীদের স্বীকার করিলে ও দাবিকে পূর্ণ করিতেই হইবে। সে গুণগুলি অতি উত্তম, সে অধিকারগুলি খুবই বাস্তব ও ন্যায় সংগত। যিনি নিখিল দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি প্রতিটি জীবজন্তু ও বস্তুর জীবন ও জীবিকা দান

করিয়াছেন তাঁহার জ্ঞান সর্বব্যাপী সুদূর প্রসারী। বিশাল ভূবনের পরতে পরতে কোথায় কি হইতেছে, তাহা একদিকে যেমন তাঁহারই ইচ্ছায় হইতেছে, তেমনি সে সম্পর্কে তিনি পুংখানুপুংখরূপে অবহিত। পাপীর পাপ, পূণ্যশীলের পুণ্য কাজ-সবই তাঁহার জ্ঞানগত। বিপন্নের কাতর প্রার্থনা, দু:খীর আহাজারী, ক্ষমা প্রার্থীর অনূতপ্ত হৃদয়ের কাতর আকুতি-সবই সমান ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নিকট পৌঁছায়। তাঁহার অজানা কিছুই নেই, তাঁহার দৃষ্টির অগোচরে কিছুতেই হইতে পারে না। তাহার দৃষ্টির অগোচরে কিছুই হইতে পারে না। তাঁহার দরবারে প্রত্যেকটি মানুষই নিজ আবেদন সরাসরি ভাবে পেশ করিতে পারে। সে জন্য কোন উকিল কিংবা পেশকারের আবশ্যক নাই! তাঁহার দুয়ার সতত সকলেরই জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত। অতএব কাহাকেও একমাত্র সৃষ্টিকর্তারূপে স্বীকার করা এবং সেই সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ মনে করা আর তাঁহার দরবারে সুপারিশ কিংবা শাফায়াতকারী রূপে তাঁহার আনুগত্য ও বিধান পালন ছাড়া অন্য কাহাকেও অছীলা ধারণ করা তাওহীদের মূলে কুঠারাঘাত করার শামিল-সন্দেহ নাই।

আল্লাহ তাআলা যখন সমানভাবে সকলের এবং সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, তখন তিনি সকলের পক্ষে সমানভাবে সুবিচার অবশ্যই হইবেন। কাহারো প্রতি তাঁহার অকারণ পক্ষপাতিত্ব থাকিতেই পারে না। কাজেই তিনি অন্য কাহারো সুপারিশক্রমে কোন পাপীকে রেহাই দিবেন কিংবা কাহারো বদদোয়াক্রমে কোন পুণ্যশীলকে তিনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন-ইহা বিশ্বাস করার অর্থ তাঁহার ইনসাফকারিতার শাশ্বত গুণকে অস্বীকার করা। যদি কেহ মনে করে যে, আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ পাইতে হইলে অন্য কাহাকে অছীলা ধরিতে হইবে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ তাআলার সুবিচার ও সুদূর প্রসারী দৃষ্টির প্রতি তাহার মাত্রই বিশ্বাস নাই-ইহা তাওহীদ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ খেলাফ। বস্তুত: একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দেওয়া পরিপূর্ণ বিধান মত জীবন যাপন করাই হইতেছে ইহকাল ও পরকালে সর্ববিধ শান্তি লাভ করার একমাত্র উপায়। ইহা তাওহীদের মূল শিক্ষা।

আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের ভূবনের একমাত্র Controller নিয়ন্ত্রণকারী। সবরকমের নীচতা, অসাহয়তা, অভাবত্ব, পরমুখাপেক্ষিতার পংকিলতা হইতে তিনি পবিত্র এবং দুনিয়ার প্রত্যকটি অণুপরমাণূ পর্যন্ত তাঁহারই প্রতি মুখাপেক্ষী; সকলেরই উপর তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত। তাঁহার কোন কাজ ও ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে, তাহার অনুমতি ব্যতীত একটুও নড়াচড়া করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি ক্ষমাশীল, মার্জনা পরায়ন-পাপীরা পাপ তিনিই মার্জনা করিতে পারেন, অপরাধ গোপন তিনিই করিতে পারেন।

যে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সমগ্র জীবনের প্রতিপালন ও জীবন যাপনের সমস্ত উপাদান যিনি প্রতিনিয়ত দান করেন, যিনি মায়ের গর্ভের গোপন কারখানার অন্তরালে তাঁহার অদ্ভুত সৃজনক্ষমতার অপূর্ব লীলা প্রদর্শন করেন, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাঁহাকেই রব্ব স্বীকার করা মানুষ মাত্রেই কর্তব্য। মানুষ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করুক ইহা তিনি মাত্রই পছন্দ করেন না। মানুষ তাঁহার আদেশানুবর্তী হইয়া জীবন যাপন করুক ইহাতেই তাঁহার সন্তুষ্টি। মানুষকে তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া চলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, এখন মানুষ বুঝিয়া শুনিয়া নিজের জন্য যে পথকে ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পারে। তাওহীদের এই বিপ্লবী ধারণা মাত্রই নতুন নয়-চিরন্তন; একেবারে আদিম। আধুনিক দুনিয়ার কোন কোন দেশে বা কোন কোন সমাজে এই ধারণা বর্তমান থাকিলেও তাহাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইহা কার্যকরভাবে মাত্রই অনুসারিত হয় না। ইহাকে প্রকাশ্য মুনাফেকী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তাওহীদ বিশ্বাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবিদার মুসলিমরাও আজ এই স্তরে নামিয়া আসিয়াছে।

তাই তাওহীদ আজ দুনিয়ার সকল মানুষকে আহব্বান জানাইতেছে, তোমরা যদি সত্যিই সৃষ্টিকর্তার একত্বকে বিশ্বাস কর, তবে জীবনের সকল কাজ-কারবারে তাঁহারই আনুগত্য কর। জীবনের কোন কাজেই দাসত্বও আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাহাকেও শরীক করিও না। আর আল্লাহর আনুগত্য করিলে তাহা নামাকাওয়াস্তে শুধু বাহ্যিক বেশ-ভূষাল কিংবা কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে করিলেই চলিবে না; একান্ত খালেছ দিলে ও খাঁটিভাবে করিতে হইবে। অন্তরের নিবিড়তর দরদ ও ঔৎসুক্য সহাকারে করিতে হইবে।

আকাশ, পৃথিবী ওসৃষ্টির উপর যাঁহার একচ্ছত্র প্রভুত্ব বলিয়া বিশ্বাস কর, তোমাদের অন্তর মুখের প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা এবং ইবাদত বন্দেগী খালেছভাবে তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর, তাঁহাকেই হৃদয় ঢালিয়া ভালবাস, নিজেকে একান্তভাবে তাঁহারই নিকট সোপর্দ করিয়া দাও। আর সেই সব দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার সম্পর্কে, উপকারী অপকারী ও হালাল হারাম নির্ধারণকারী হিসাবেও একমাত্র তাঁহারই নির্দেশ মানিয়া চল। এ সম্পর্কে অন্য কাহারো কোন অধিকার বা ক্ষমতা আছে বলিয়া মনে করিও না-স্বীকার করিও না। কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো হালাল হারাম জায়েয নাজায়েয বা বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করার অধিকারী দান করা পরিষ্কার শিরক। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে এক আল্লাহ তাআলার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত করাই হইতেছে তাওহীদের প্রকৃত অধিকার। এ অধিকার অনস্বীকার্য। অতএব বর্তমান দুনিয়ার গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিজম প্রভৃতি যত রাজনৈতিক আদর্শের প্রচলন আছে এবং পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও সম্পত্তির তোমরা স্বীকার করিতে পারে না, নিজেদের আর্দশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পার না।

www.priyoboi.com www.priyoboi.com www.priyoboi.com

কারণ নির্বিশেষে এই সবগুলি নীতিই মানুষের রচিত-মানুষের অনুর্বর ও অপরিনামদর্শী মস্তিস্ক হইতে প্রসূত, তাহার অপূর্ণ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও ভিত্তিহীন ধারণার উপর স্থাপিত। তদূপুরি ইহার কোন একটিও গ্রহণ করিলে ইসলামের আদর্শ হইতে তোমরা ততখানিই বিচ্যুতি ঘটিবে-দূরে সরিয়া যাওয়া হইবে। ইসলাম আল্লাহর পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। এবং তাহার সবই দুনিয়ার মানব রচিত নীতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একবারে আলাদা জিনিস। আল্লাহর উপাসনা ও বন্দেগী করার সংকীর্ণ পরিবেশ তাওহীদকে স্বীকার করিয়া কর্মজীবনের বিপুল ক্ষেত্রে এই সব মানব রচিত নিয়ম বিধান কবুল করা ও অনুসরণ করা তাওহীদেরই ভিত্তিমূল চিরতরে চূর্ণ করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবং ঠিক এর জন্য তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো আইন মানিয় না; জীবনে কোন ক্ষেত্রেই নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও অন্য কোন মানুষকে আইন রচনার অধিকার দিও না। অন্য কাহারো রচিত আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করিও না। মানুষের রচিত কোন নীতি অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করিও না। মানুষের রচিত কোন নীতি অনুযায়ী তোমাদের রাষ্ট্র, তোমাদের সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা পরিচালিত করিও না, মানব প্রভুত্বের বুনিয়াদে গঠিত হইয়াছে যত রাষ্ট্র তাহা গণতান্ত্রিকই হউক কিংবা সমাজতান্ত্রিক, তোমরা তাহার কোনটারই আনুগত্য স্বীকার করিও না। মানব রচিত আইনের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে যে সব আদালত ফৌজদারী তাহার নিকট তোমরা কোন বিচার প্রার্থনা করিরও না। কারণ বিচার করার কোন অধিকার এবং সুবিচার করার ক্ষমতাই তাহার নাই। কুরআনের পরিভাষায় ঐ সবগুলি প্রতিষ্ঠানেরই নাম হইতেছে তাগুত। এই তাগুতকে একেবারেই অস্বীকার কর এবং মনুষ্য সমাজে একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই প্রভুত্ব ও আইন স্থাপিত কর-আজিকার দুনিয়ার নিখিল মানুষের কাছে ইহাই হইতেছে তাওহীদের অকুণ্ঠ ও ঐকান্তিক দাবি।

قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنُ فِتْنَتٌ وَّيَكُو}نَ الدَيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ -

আল্লাহ তাআলাকে যাহারা অমান্য করে, তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, তাহাদিগকে হত্যা কর, যেন দুনিয়ায় ফেতনা ফাসাদ কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকে এবং সমস্ত রাজত্ব, আধিপত্য ও আইন যেন একমাত্র আল্লাহরই স্থাপিত হয়।

তাওহীদের প্রভাব

আল্লাহ তাআলাই আমার ও নিখিল দুনিয়ার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র মালিক, একচ্ছত্র আইন রচয়িতা, একমাত্র আশা ও ভয় করার যোগ্য এবং একমাত্র উপাস্য- আল্লাহ ছাড়া

www.priyoboi.com www.priyoboi.com www.priyoboi.com

এই সব ব্যাপারে আমি আর কাহাকেও স্বীকার করি না, মান্য করি না।----ইহা তাওহীদের এক বিরাট বিপ্লবী ঘোষণা। আমরা যখন পড়ি : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু তখন আমরা ঠিক এই কথারই ঘোষণা করিয়া থাকি।

ইহা মানবতার এক দুর্নিবার ও তেজপূর্ণ দাবি। ইহা যুগপৎভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া লয়। ইহা মানুষের সমগ্র জীবনটাকে লইয়া প্রলয়ংকর কাঁপন লাগাইয়া দেয়। মানুষের আকীদাহ ও বিশ্বাস হইতে শুরু করিয়া সমগ্র কর্ম-জীবন এক প্রচন্ড ইনকিলাব সৃষ্টি করিয়া তাওহীদ বিরোধী সমস্ত বিশ্বাস ও কাজকে মানুষের জীবন হইতে নি:শেষে অপসৃত করিয়া দেয়। তাহার মধ্যে জীবনকে, তাহার মতবাদ, চিন্তাধারা, ইচ্ছা বাসনা, হৃদয়াবেগ এবং দৃষ্টিভংগীকে সৃষ্টিকর্তার দেওয়া কিতাবের শিক্ষার সাজে ঢালিয়া গঠন করে। তাহার মনোজগতের সবচেয়ে উচ্চতম স্থানে অভিষিক্ত করে আল্লাহর প্রেমকে, সে হইয়া যায় সর্বোতভাবে খোদার, খোদাময়। জীবনের যে কোন ব্যাপারেই সে আল্লাহ তাআলাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও নিজের নাফসকে, দেশচলতি প্রতাকে এবং শাসকদের রচিত আইনকেও মাত্রই স্বীকার করে না। দুনিয়ার লোক-সমাজের উপর আল্লাহ ছাড়া আর যাহার যাহার প্রভুত্ব চলিতেছে, সেই সমস্তকেই সে মনে করে অনধিকার চর্চা করার অপরাধে অপরাধী।

তাওহীদের এই বিশ্বাস ও ঈমান মানুষের মনে ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে ও পূর্ণত্ব লাভ করিতে থাকে। পরিণামে তাহার মন জীবনের সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ প্রেরিত নবীকেই নিজের একমাত্র নেতা ও পথপ্রদর্শক মানিয়া লয় এবং তাঁহার বিরোধী কিংবা তাঁহার অধীনতা হইতে মুক্ত সমস্ত প্রকারের নেতৃত্বকেই সে অস্বীকার করে-পৃথিবী হইতে তাহাকে উৎপাটিত করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। কাজেই তখন সে শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, তখন সে পূর্ণ করিয়া বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর কিতাবকে জীবনের পরিপূর্ণ বিধান বলিয়া স্বীকার করা, সেই কিতাবে উল্লেখিত সমস্ত রীতি-নীতি, হুকুম-আহকাম ও আদর্শকে নিজের কর্মজীবনে পরিস্ফুট করিয়া তোলা এবং মানব জীবনে উহা ছাড়া অন্য কোন আইনের কিংবা রাজনীতির আধিপত্যকে মাত্রই বরদাশত না করা তাওহীদ-বিশ্বাসের বাস্তব নমুনা। তাওহীদের এই প্রভাব যে পরিমাণে পরিলক্ষিত হইবে, মনে করিতে হইবে তাহার অন্তরের মধ্যেও তাওহীদের সেই বীজ তত পরিমাণে বর্তমান। বীজ ও গাছের মধ্যে যে সম্পর্ক তাওহীদের এই বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী কাজের মধ্যেও ঠিক সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। বীজের মধ্যে যাহা কিছু যেভাবে বর্তমান থাকে, গাছের আকারে ঠিক তাহাই সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাহির পৃথিবীতে। এমন কি গাছের পরীক্ষা করিয়া অনায়াসেই বলিতে পারা যায় উহার বীজের মধ্যে কি ছিল আর কি ছিল না। পক্ষান্তরে বীজ ব্যতীত যেমন গাছের কল্পনা করা চলে না, উর্বরা জমিতে ভাল

বীজ বপন করা অথচ তাহাতে গাছের উদগম না হওয়াও ঠিক তেমনি অস্বাভাবিক। তাওহীদ বিশ্বাস এবং মানুষের ব্যাপক কর্মজীবন ও ঠিক এইরূপ। যেখানে বিশ্বাস বর্তমান; কর্মজীবনে তাহার চরিত্রে ব্যবহারে আদান-প্রদান ও চেষ্ঠা সাধনায় রুচি ও প্রকৃতিতে সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োগে-মোট কথা জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাহার বাস্তব অভিব্যক্তি অনিবার্যরূপেই হইতে বাধ্য। বাহ্যিক প্রকাশ যেখানে দেখা যাইবে না, মনে করিতে হইবে, বুকের অন্তরালে উহার বিশ্বাসের অস্তিত্ব নাই।

তাহার পর মহান সৃষ্টিকর্তার ভয় করিয়া, পরকালের পাপ-পূণ্যের হিসাবের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ ও অপছন্দীয় কাজ করিতে পারে না। তাহার জীবন প্রাণ বিপন্ন হইতে পারে, তাহার লাখ টাকা ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু তবু সে এমন কাজ কিছুতেই করিতে পারে না। যাহা আল্লাহর নিষিদ্ধ, যাহা আল্লাহর অপছন্দনীয়। মানুষ যখন আল্লাহ তাআলাকে তাঁহার সমস্ত প্রকারের গুণ গরিমা সহকারে বিশ্বাস করে, স্বীকার করে, তখন সে তাহার এই তাওহীদ-বিশ্বাসের সরল-সহজ পথ হইতে কোন ক্রমেই বিচ্যুত হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া শক্তি-সামর্থ, সময়-যোগ্যতা, অর্থ ও সম্পত্তি কোন কিছুকেই সে আল্লাহ-নির্ধারিত পথ ও নিয়মের বিপরীত কোন কাজে প্রযুক্ত করিতে পারে না। এই অনুপ্রেরণা তাওহীদ বিশ্বাসীর মনে প্রাণে যখন তাহার পূর্ণ আসন অধিকার করিয়া বসে, তখন সে সৃষ্টিকর্তার সকল নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ হইতে ঠিক সেই প্রকারই বাঁচিয়া থাকে যেমন সমস্ত জীবজন্ত, দূরে সরিয়া থাকে সমস্ত প্রকারের ক্ষতিকর জিনিস হইতে।

মানুষের অভ্যন্তরে এই তীব্র প্রেরণা জাগাইয়া তোলা তাওহীদের প্রথম প্রভাব। ইহা মানুষের সমগ্র জীবনকে ইসলামের একই রঙের করিয়া তোলে। কিন্তু এই প্রেরণা জাগাইয়া তোলা একদিকে যেমন কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার, অন্যদিকে ইহা খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং অতি তাড়াতাড়ি অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইহা খুব ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করে এবং দীর্ঘকালীন সাধনার পর ফুল ফুটায় এবং ফল দান করে-যেমন বীজ হইতে গাছ এবং সেই গাছে ফুল ও ফল হইয়া থাকে একটা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে এবং অনেক দেরীতে।

এইভাবে ধীরে ধীরে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ভিতর দিয়া মানুষ যখন এই অধ্যায়ে পূর্ণত্ব লাভ করে, তখনি তার আরম্ভ হয তাওহীদের পরিবর্তী এবং সর্বশেষ স্তরের মহাযাত্রা। এইখানে আসিয়া পৌঁছিলে মানুষের হৃদয়-মন আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং রাসূলের প্রচারিত জীবনধর্মের সাথে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলার গভীর প্রেমে সে নিজেকে এবং নিজের সব কিছুকেই তাঁহারই দরবারে অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দিয়া কোন কাজে সৃষ্টিকর্তা সন্তুষ্ট হইবেন, তখন মানুষ কেবল তাহারই তালাশ করিয়া

ফিরে। কেমন করিয়া তাঁহার অফুরন্ত রহমত লাভ করা যাইবে, অহর্নিশ শুধু সেই চিন্তায়ই মশগুল হইয়া থাকে। এই পর্যায়ে মানুষ উন্নীত হইয়া মানুষ তাহার নিজেকে, তাহার পারিপার্শ্বিক সমাজকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে, নিরীক্ষণ করে; আর সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই সে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলিকে দূর করিয়া দিয়া পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর প্রভূত্বকে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করে। সে একদিন যেমন নিজের মধ্যে গায়রুল্লাহর বিন্দুমাত্র প্রভুত্বকে সহ্য করিতে পারে না, তেমনি এই দুনিয়ার কোন অংশে কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রভুত্বকে সে কিছুতেই থাকিতে দিতে পারে না। গায়রুল্লাহর আধিপত্য ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তাহার এই ক্ষমাহীন অভিযান দুর্নিবার ভাবে চলিতে থাকিবে ততদিন, যতদিন তাহার মনে বীর্য আছে- দেহে প্রাণ আছে। সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টি এই মানুষ জাতি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মানুষ কিংবা বস্তুর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া, তাহার দাসত্ব করিয়া মরিবে, ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

বস্তুত তাওহীদের এই ব্যাপক অর্থের প্রতি কার মধ্যে কতখানি বিশ্বাস আছে, তাহা নি:সন্দেহে বুঝিতে পারা যায় এই তাওহীদের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা এই আইনকে দুনিয়ায় প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার সাধনার দিক দিয়। তাওহীদের প্রতি যাহার বিশ্বাস যত তীব্র এবং দৃঢ় সে তত অক্লান্ত ও নিস্বার্থভাবে তাগুতের প্রভুত্ব উৎপাটিত করিয়া দিয়া আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বকে স্থাপিত করিবার জন্য সাধনা করিবে। পক্ষান্তরে যাহার মধ্যে এই বিশ্বাস যত ম্লান ও দুর্বল, আল্লাহ তাআলার হুকুমতে কায়েম করার সাধনা তাহার জীবনে তত কত পরিলক্ষিত হইবে। বরং তাহার জীবনের প্রত্যেক কাজ কর্মে দেখা যাইবে তাওহীদ ও শিরকের সাথে শুধু গোজামিল দেওয়ার হীন প্রচেষ্টা। মুখে মুখে তাওহীদ বিশ্বাসের বড় বড় দাবি শোনা যাইবে, কিন্তু কাজে কর্মে দেখা যাইবে তাগুতের প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকার। এবং এইভাবেই সে নিজের মন ও জীবনকে অসংখ্যা প্রভুর দাসত্বের জালে জড়াইয়া ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া পড়িবে। দুনিয়াব্যাপী এই যে শয়তানের নিরুংকুশ রাজত্ব চলিতেছে আর তাওহীদ বিশ্বাসের দাবিদারগণ যে নিজেদের জান-মাল কুরবান করিয়া আরো মজবুত করিয়া তুলিতেছে, ইহা দ্বারা কি নিশংসয়ে বুঝা যায় না যে, তাহারা নিজের সমগ্র জীবনে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার প্রভুত্ব, মালিকত্ব ও আইন রচনার অধিকারক মাত্রই স্বীকার করে না। মানুষের জীবন এক অবিভাজ্য ইউনিট, ইহাকে টুকরা টুকরা করা, ইহার রাজনীতি ও ধর্মকে দুইটি আলাদা ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাওহীদবাদী মানুষ সৃষ্টিকর্তা, উপাস্য ও প্রভুরূপে যেমন এক আল্লাহকেই স্বীকার করে, ঠিক তেমনি সে নিজের সমগ্র জীবনের বাদশাহ ও আইন রচয়িতা হিসাবে এক আল্লাহকেই স্বীকার করে। মানুষ ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় কাজে আল্লাহ তাআলার নিয়ম পালন করিবে; কিন্তু রাজনীতি, শাসনতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক কাজ কারবারে দুনিয়ায় প্রচলিত রীতিনীতির

অনুসরণ করিবে-এই প্রকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলা তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বস্তুত : তাওহীদবাদী মানুষ তাহার ব্যক্তিগত জীবন হইতে শুরু করিয়া পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সমগ্র ব্যাপারেই তাওহীদবাদীই থাকিবে-এক আল্লাহ তাআলার নিয়ম-কানুন পালন করিয়া চলিবে, কোন ক্ষেত্রেই সে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত পন্থা পরিত্যাগ করিবে না।

মানুষ নিজে যে মত পোষণ করে সেই মতের প্রচার এবং উহার বিরুদ্ধ মতের বিরোধিতা করা- এমন কি দুনিয়া থেকে উহাকে বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে তাহার নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া চেষ্টা করা মানব-প্রকৃতির এক চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য। কোন মানুষ নিজের মত প্রচার না করিয়া পারে না। কাজেই মানুষের বাহ্যিক রুচি-প্রকৃতি এবং কাজ-কর্মের ব্যাপারে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় তাওহীদকে কে কতখানি বিশ্বাস করে, আর কে কতখানি করে অবিশ্বাস।

অতএব তাওহীদ কেবল মাত্র একটা দার্শনিক কিংবা ধর্মীয় তত্ত্ব-ই নয়, ইহা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ধর্মীয় আদর্শ। মানুষের ব্যক্তি, সমাজ, তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর উহার গভীর প্রভাব অনিবার্যরূপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। সেই প্রভাব পরিলক্ষিত না হইলে তাওহীদ বিশ্বাসের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। এই তাওহীদ ব্যক্তি-মানুষকে এক পরিপূর্ণও অতুলনীয় আজাদী দান করিয়া সৃষ্টি জগতে তাহাকে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট করিয়া তোলে। সমগ্র দুনিয়া এবং উহার ভিতরের সমস্ত বস্তুই শুধু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষ তাহা নিজের কাজে ব্যবহার করিবে, তাহান ভোগ করিবে; তাহা দ্বারা দুনিয়ার উপর শুধু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষ তাহা নিজের কাজে ব্যবহার করিবে, তাহা ভোগ করিবে; তাহা দ্বারা দুনিয়ার উপর শুধু আল্লাহ তাআলার হুকমাত কায়েম করিবে; ইহাই হইল মানুষের একমাত্র কাজ। কিন্তু তাওহীদকে বিস্তারিত রূপে অনুধাবন না করিলে এবং কর্মজীবনে উহাকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করিলে মানুষের প্রাপ্য সে কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। বরং তাহার কাপুরুষতা ও নীচতা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, দুনিয়ার সামান্য জিনিস দেখিয়াও সে ভয় পায়; তাহার অন্তরাত্ম কাঁপিয়া উঠে। যে সব জিনিস মানুষের গোলামী করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, এহেন মানুষ নিজেই সেই সবের দাসত্ব ও আনুগত্য করিতে শুরু করে। নিজেরই মত মানুষকে প্রভু, মালিক, মনিব, আইন-রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করে, একান্ত দাসানুদাসের মত তাহাদের সম্মুখে অবনত হয়, মাথা লুটায়। তাহাদের অন্নদাতা ভাগ্যবিধাতা নবজাতির জন্মদাতা নবরাষ্ট্রের স্রষ্টা, দেশ ও জাতির রক্ষাকর্তা এবং দরিদ্রের মা বাপ প্রভৃতি মুশরেকী উপাধিতে ভূষিত করে।

এমন কি জীবিত লোকদের অতিক্রম করিয়া মৃতদের কবরে পর্যন্ত হাজীর হয় এবং কবরস্থ লোকদের নিকট নিজেদের আবেদন ও অন্তরের ব্যাথা বেদনা জানাইয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করে! প্রকৃতিক নিয়মের উপয় এইসব মৃত ব্যক্তিদের হাত আছে বলিয়া মনে করে। অদৃশ্য জগত সম্বন্ধে ইহারা জ্ঞাত এবং মানুষের ক্ষতি বা উপকার সাধনের ব্যাপারে ইহাদের অব্যর্থ ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। ধীরে ধীরে এই সব তাওহীদ-বিহীন মানুষ প্রত্যেকটা পাথর, অলী-দরবেশের প্রত্যেকটা কবর ও প্রত্যেকটা বৃক্ষকে উপাস্য দেবতা হিসাবে হিসাবে গণ্য করিয়া এবং অতীতকালে কোন শক্তিমতির প্রতিমূর্তি গড়িয়া উহার পূজা করিতে শুরু করে। তাহার কাছে মাথা নত করিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করে। প্রত্যেকটা ঘন-নিবিড় জংগল, প্রত্যেকটা উপকারী ও অপকারী জিনিসই তাহাকে আহ্বান জানায় তাহার দাসত্ব করিবার জন্য ইহাদের কোন একটারও সম্মুখে নিজের আত্মাকে লাঞ্ছিত করিতে এবং তাহাকে তাহা পদদলিত করিতে দিতে তাহার কোনই দ্বিধা সংকোচ হয় না। ফলে তাহাকে তাহা পদদলিত করিতে দিতে তাহার কোনই দ্বিধা সংকোচ হয় না। ফলে তাহার মর্যাদা-মহাত্ম্যের উচ্চতম স্থান হইতে পতিত হইয়া সে ক্রমশ: গড়াইয়া কেবল নীচের দিকেই পড়িতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাহাকে যে সম্মান ও বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছিলেন, তাহাকে সে চিরদিনের তরে হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু তাওহীদের প্রচন্ড প্রদীপ্ত আলো যখনই মানুষের হৃদয়জগতকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে, তখন সহস্য তাহার হৃদয় মনে ও কর্ম জগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা হয়। যে মানুষকে এখনই দেখা গিয়াছিল দুনিয়ার সমল সামান্য জিনিস হইতেও নিকৃষ্ট ও নীচ, তাওহীদের বলে সে নিমিষে এতদূর শক্তিমান হইয়া পড়ে, তাহার সম্মান এত উচ্চ ও উন্নত হইয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলাকে ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসই তাহার নিকট অপেক্ষা হীন ও মূল্যহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে শুরু করে। মানুষ একমাত্র এই তাওহীদকে গ্রহণ করিয়াই প্রকৃত আজাদী লাভ করিতে পারে, অন্য কিছু দ্বারা নয়। আজাদীর যতগুলি মত ও ধারণা দুনিয়ার বর্তমান আছে, তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই মৌলিক ভাবে নিহিত আছে মানুষের গোলামী। গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম বা ডিক্টেরবাদ-যার কথাই বলা হোক না কেন, ইহার কোনটাই মানুষকে প্রকৃত আজাদী দান করিতে পারে না, মানুষের গোলামীর নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে আমার এই দাবির সত্যতা প্রমাণ করে।

কিন্তু তাওহীদের ভিতরে এই বিপ্লবী আগ্নেয়-শক্তি আসে কোথা থেকে? তাওহীদবাদী মানুষের কাছে এই নিগূঢ়তত্ব উদঘটিত হইয়া যায় যে, সুখ-দু:খ, জীবন ও মৃত্যু, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য-সবকিছুরই আসিবার ও যাইবার একটি মাত্র পথই বর্তমান, কাজেই সকল অবস্থাতেই সে তাহার সমস্ত আশা-আকাংখা সেই একই পথে নিবদ্ধ করে,

সেই একই পথকে সে ভয় করে। সে নিশ্চিতরূপ জানে যে, এই দুনিয়া বিভিন্ন দেবতাদের কিংবা বিভিন্ন প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের লীলাক্ষেত্র নয়, বরং একমাত্র মালিক ও সর্বাভিজ্ঞ আল্লাহ তাঁহার নিজ ক্ষমতা ও প্রতিভার বলে এই বিশ্ব কারখানাটা পরিচালিত করিতেছেন। তাহার ইচ্ছা ও হুকুমের বিপরীত এই পৃথিবীর কোন কাজ-কর্মে একবিন্দু হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন ক্ষমতা এই বিশ্বভুবনে কাহারো নাই। সে ইহাও জানে যে, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সত্য ও সত্যপ্রিয়, এই জন্যই এই দুনিয়ার অবিমিশ্র বাতিলের কোনই অস্তিত্ব নাই! সে একান্তরূপে বিশ্বাস করে যে, আইন রচনা করার অধিকার বা ক্ষমতা কোন মানুষেরই নাই-কাজেই সে অন্য মানুষকে ভয় করিবে কেন? তাহার রচিত আইন পালন করিবে সে কিসের জন্য? যাহার নিকট এই মহান সত্য ধরা পড়িয়াছে, সে এক বিরাট, অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছে। তাহার এই ধনাগার চিরস্থায়ী, তাহার জীবন চিরন্তন ও অক্ষয়, সে মরিয়াও অমর।

দু:খ-শান্তির সকল অবস্থাতেই এই শ্রেণীর মানুষের মন মগজ ও ঈমান থাকে অবিচালিত। প্রাচুর্য ও অভাব কোন অবস্থাই তাহার মনের স্থির ও গভীর প্রশান্তিকে চূর্ণ করিতে পারে না। ইহারা হাতাশা হয় না, নিরাশার ঘন অন্ধকার ইহারা কখনো নিজদিগকে হারাইয়া ফেলে না। গৌরব, অহংকার, নির্বুদ্ধিতায় ইহার কোন সময়ই নিজেদের পায়ে কুঠার মারে না। যে প্রকার হাসিমুখে তাহারা সুখের সময়কে অভিনন্দন করে, বিপদ ও পরীক্ষার কঠিন মুহূর্তের-ও তাহারা সম্বর্ধনা জানায় মনের অনুরূপ অবিচল বিশ্বাসে।

একজন তাওহীদবাদী মানুষের অন্তর্দেশ এমনিই হইয়া থাকে। অন্তরের দিক দিয়া সে পরিপূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত হয় এবং এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ধীরে ধীরে তাহার বর্হিদেশ ও কর্মজীবনকেও সৌন্দর্যমন্ডিত ও মহিমান্বিত করিয়া তোলে। প্রকৃতিক নিয়মের কাছে সে নিজে যেমন অসহায় ও অক্ষম, মানুষের কর্মজগতের জন্য আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধানের সম্মুখে সে নিজে ইচ্ছা করিয়া ঠিক তেমনি অক্ষমতাকে গ্রহণ করে। আল্লাহর দেওয়া আজাদী সে ইচ্ছা করিয়া নিজ খুশীমত তাঁহারই ইচ্ছার সমীপে সোপর্দ করিয়া দেয়। সূর্য, চন্দ্র, বৃষ্টি ও বায়ু, নদী ও পর্বত নিত্যন্ত জড়পদার্থ বলিয়া বাধ্য হইয়াই দাসত্ব করে, তাহার নিজের আনুগত্য করে। কেননা তাহা না করিলে সে সবের কোন উপায় নাই; কিন্তু তাওহীদবাসী মানুষ নিজেরাই নিজেদের নাকে রশি-বাঁধিয়া চারিদিকের এই বিরাট কাফেলার সহিত চলিতে শুরু করে। ইহাই হইতেছে মানুষের আসল মর্যাদা! এবং এই ইচ্ছাগত নতি স্বীকার ও আনুগত্যই হইতেছে তাওহীদের মর্মকথা। এইভাবে নিজেকে আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে যে যতদূর অগ্রসর এবং পরিপূর্ণ হইতে পারিবে তাওহীদের পথে চলবার সর্বপ্রথম স্তরের মানুষ নিজের নফসের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করে।

দ্বিতীয় স্তরে সে নিজের জাতি, দেশ, জন্মভূমি এবং প্রচলিত সমগ্র রীতিনিতি ও আইন প্রথার সমস্ত বন্ধন হইতে পরিপূর্ণরূপে আজাদ হইয়া একান্তভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে এবং সর্বশেষ স্তরে মানুষ মনের ঐকান্তিক আগ্রহে ও আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে ইহজীবন অপেক্ষা আল্লাহর নৈকট্য ও সাহচর্যকেই অধিকতর সব কিছুকেই একন্তভাবে উৎসর্গ করে মহান আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে-এই দুনিয়ার বুকে আল্লাহর হুকুমাত কায়েম করিবার করিবার মহত্তর উদ্দেশ্যে। তাওহীদ পথের ইহা যেমন শেষ মঞ্জিল, মানুষের উন্নতিরও ইহা সর্বশেষ স্তর।

বল, হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সমস্ত ইবাদাত-বন্দেগী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ তাআলার জন্য উৎসর্গকৃত; যিনি সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও প্রভু। এইসব ব্যাপারে কেহই তাঁহার শরীক নাই। আমার সমস্ত কিছুই এমনিভাবে তাঁহারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে এবং এইজন্য, আমি প্রথমে অন্য সকলের আগেই নিজকে তাঁহারই সমীপে সোপর্দ করিলাম।

তাওহীদের গুরুত্ব

মানবদেহে হৃৎপিন্ডের যে গুরুত্ব ইসলামের সমগ্র ধর্মব্যবস্থায় তাওহীদেরও ঠিক সেই মর্যাদা বর্তমান। হৃৎপিণ্ড যদি সুস্থ-সবল ও সক্রিয় থাকে, তবে মানুষের শরীরও থাকে স্বাস্থ্যবান, তেজপূর্ণ। ঠিক এই কারণেই তাওহীদ ব্যতীত মানুষের কোন কাজই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না, সুফল দান করিতে পারে না। এই তাওহীদকে পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লওয়ার পর আশা করা যায়, মানুষের অনিচ্ছাকৃত পাপ মার্জনা করা হইবে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষের শিরক কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। এতদ্ব্যতীত অন্য পাপকে ইচ্ছা হইলে তিনি ক্ষমা করিবেন।

কিন্তু তাওহীদের এই গুরুত্বের মূলীভূত কারণ কি? কারণ এই যে, মানুষের সমগ্র জীবনধর্ম ইমারত তিনটি জিনিসের উপর স্থাপিত: তাওহীদ নব্যুয়াত এবং পরকাল। ইহার অর্থ এই যে, সমগ্র জীবনধর্মের এক তৃতীয়াংশ হইতেছে এই তাওহীদ, আরো একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, তাওহীদ হইতেছে জীবন ধর্মের মূলকথা একেবারে কেন্দ্রীয় ধারণা। নবুয়্যত ও পরকাল-বিশ্বাস তাহার অনিবার্য শাখা মাত্র। কারণ আল্লাহ তাআলাকেই একমাত্র জীবন-বিধান প্রস্তুকারী এবং আইন রচিয়তা হিসাবে স্বীকার করাই হইতেছে তাওহীদের মর্মকথা। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর হুকুম বিধান বিশ্বমানবের নিকট পৌঁছান তাঁহার নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে। কাজেই ইহাতে আর কোনই সন্দেহ

থাকিতেছে না যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) কে রাসূল এবং জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে অনুসরণযোগ্য একমাত্র নেতা হিসাবে স্বীকার করা তাওহীদের একটি প্রধান ও অবিভাজ্য অংশ। আল্লাহ তাআলাকে যে ব্যক্তি এক বলিয়া মানিবে; কিন্তু হযরত মুহাম্মাদের উপস্থাপিত শরীয়াত বা জীবন-বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করিবে না সেতো কাট্টা মুশরিক, তাওহীদের সাথে তাহার কোনই সম্পর্ক থাকিতে পারে না। তাহার পর থাকিয়া যায় পরকালের বিশ্বাসের গোড়ার কথাই হইতেছে এই তাওহীদ। যাহারা পরকাল-বিশ্বাস করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা আল্লাহ তাআলার সহিত শরীক করে এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে আরো অনেকের অধিকারকে স্বীকার করে, পরকালের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস একেবারেই অর্থহীন। এই সব আলোচনার দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, জীবন-ধর্মের সমস্ত ব্যবস্থাই তাওহীদের উজ্জ্বল আলোকে ভাস্কার ওদীপ্তমান। ইহা ব্যতীত কোন বিশ্বাস যেমন মাত্রই কার্যকরী হইতে পারে না, তেমনি জীবনের কোন কাজই ফলপ্রদ হইতে পারে না। এই তাওহীদ থেকেই শুরু হয় জীবন ধর্মের প্রথম পদক্ষেপ, আবার এখানেই অংকিত হয় তাহার শেষ পদরেখা। শুরুতেও তাওহীদ এবং শেষপ্রান্তেও এই তাওহীদই বর্তমান। শরীয়তের হুকুম আহকাম ও আল্লাহর আইন-কানুগুলি প্রকৃত পক্ষে সেই কালেমা তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছিবার উপায় এবং পন্থা মাত্র।

তাওহীদের এই অসাধারণ গুরুত্বের কারণেই প্রত্যেক নবী এবং রাসূলই নিজ নিজ দাওয়াত শুরু করিয়াছেন এই তাওহীদ থেকেই। তাঁহারা এই কেন্দ্র-বিন্দুতে এমন মজবুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁহারা সেই বিন্দু থেকে বিচ্যুত হন নাই; হইতে রাজী হন নাই। বিচ্যুত হওয়া তো দূরের কথা, এই মূল তাওহীদ প্রচার করার ব্যাপারে কিছুমাত্র খোশামুদী কিংবা নরম-নরম ভাব অবলম্বন করে নাই। এই ব্যাপারে কোন প্রকারের দুর্বলতা বা ক্লান্তি কিংবা বাতিলের সহিত সমঝোতার মনোভাবের তাঁহারা মাত্রই প্রশ্রয় দেন নাই। সকল রকমের বাধা-বিপত্তিকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া তাহারা সম্মুখের দিকে-বঞ্চিত মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের এই বিপ্লবী দাওয়াত বাণী প্রচার করিতে তাঁহারা মাত্রই কুণ্ঠিত বা বিচলিত হন নাই। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তাহারা মুষ্টিমেয় সঙ্গী সাথীদের লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগ করত: সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা এই তাওহীদের বাণী। ইহারই জন্য তাঁহার সবকিছু অকাতরে বিসর্জন দিয়াছেন। সবকিছু ছাড়িয়া শুধু একটি মাত্র জিনিসকেই সমস্ত জীবনের সাথী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই তাওহীদের রক্ষা করিবার জন্য তাওহীদবাদীগণ নিজেদের অতি নিকটাত্মীয়দের বুকে ছুরি চালাইতেও মাত্রই দ্বিধা করেন নাই। ইহারই জন্য স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ করিয়াছে। সমস্ত প্রকারের পূর্ব আত্মীয়তা ছিন্ন হইয়া-গিয়াছে সেই সব লোকের দ্বারা যাহার ছিলেন মানবতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক

এবং দয়া-ভালবাসা, সারল্য ও উদরতা এবং আত্মীয়তা রক্ষার বাস্তব প্রতিমূর্তী। মানব-জীবনে তাওহীদের গুরুত্ব এতখানি যে, মানুষের এক হাত যদি তাওহীদের বিরোধীতা করে, তবে অন্য হাত দ্বারা তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ কিংবা ব্যথা অনুভবও করা যাইতে পারে না।

কারণ, আকাশের তলে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় অনস্বীকার্য অধিকার এবং তাঁহার সেই ব্যাপক ও বিরাট অধিকারকে স্বীকার করা যায় কেবলমাত্র এই তাওহীদের মাধ্যমে। বস্তুত: ইহাই সুবিচার ও সু-শৃঙ্খলার মূল বুনিয়াদ। এই অধিকার যে ভাল জানেন বা পূর্ণমাত্রার স্বীকার করে না, সে দুনিয়ার কাহারো হক চিনিতে পারে না,- তাহার নিজেরও নয়। ফলে তাহার দ্বারা এমন সব জুলুম ও না-ইনসাফী, শোষণ ও উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইবে যেমন অনুষ্ঠিত হইতেছে বর্তমান দুনিয়ার সব তাওহীদ-বিরোধী জালিম ও অকৃতজ্ঞ মানুষের দ্বারা।

দুনিয়ার যুগে যুগে নবী আসিয়াছেন এবং তাঁহার আজীবন সাধনার ভিতর দিয়া এই তাওহীদেরই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাওহীদের এই ব্যাপক ও বিপ্লবী রূপ নির্দিষ্ট কোন কালের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, ইহা চিরকালীন, শাশ্বত ও চিরন্তন। সৃষ্টির প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহা কার্যকরী থাকিবে এবং চিরদিনই ইহা ইহতে সেই শক্তি ও উপকারিতা লাভ করা সম্ভব, যাহা বারে বারে পৃথিবীতে দেখানো হইয়াছে নবীদের বিপ্লবী সাধনার ভিতর দিয়া। কিন্তু তাহার জন্য অপরিহার্য শর্ত এই যে, তাওহীদের সেই আসল ধারণা প্রকৃত রূপকেই গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রহণ করিতে হইবে উহার সমগ্রটাকে। আর তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য সঠিক সেই পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম।

তাওহীদকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার যে পন্থা আম্বিয়ায়ে কেরাম দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণতা: কার্যকরযোগ্য-বাস্তব ও সামাজিক। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহার বিপ্লবীরূপ নিখুঁতরূপে দেখিতে পাই আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপক আন্দোলনের মাধ্যমে এবং সেখান থেকেই দেখিতে পাই সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা কি বিরটা বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে: আর ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে করিতে পারে কী অভূতপূর্ব শক্তিদান।

তাওহীদের এই আওয়াজ যখন মানব সমাজে উত্থিত হয়, তখন চারিদিকে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাওহীদ বিশ্বাসী মানুষেরা চারিদিকে হইতে সকল প্রকার সম্বন্ধ ও সংস্কারের আগল ভাংগিয়া অগ্রসর হয় এই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে। ভাংগার পরেই জাগে সংগঠন বা পুনর্গঠনের অনুপ্রেরণা। ইহা ধ্বংসের পরে সৃষ্টির চিরন্তন দাবি। কাল বৈশাখী ঝড় প্রশান্ত সমুদ্রের বুকে প্রলয় তুফানের সৃষ্টি করে, কিন্তু তাহাকে পরিচালিত করে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দিকে। বহুকে ভাংগিয়া একের প্রতিষ্ঠা-ই হইতেছে তাওহীদের প্রকৃতি।

তাওহীদের কেন্দ্র বিন্দুতে বিভিন্ন মানুষের জামায়েত হওয়ার পর যে সমাজ সৃষ্টি হয়, তাহার রূপ এক, রঙ এক, আদর্শ এক, লক্ষ্যও এক। তাহা গলানো ধাতুর তৈরী প্রাচীরের মতই দুর্ভেদ্য। সেই এক এর উদ্দীপনা নিখিল মানবের মনে জাগায় বিভেদ ও বিচ্ছেদের সমস্ত প্রকার চূর্ণ করিয়া একেরই সমতল পটভূমিতে সমবেত হওয়ার আকুল পিপাসা। মানবাতীত শক্তি ও অধিকারের ক্ষেত্রে যেমন তাহারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাহাকেও স্বীকার করে না-দুনিয়ার মানুষের মধ্যেও তাহারা স্বীকার করে না কোন প্রকারের বৈষম্য ও ভেদাভেদ। আঞ্চলিক, জাতিগত, ভাষাগত, কিংবা শ্রেণী ও বর্ণগত সমস্ত বৈষম্যকেই তাহারা চূর্ণ করিয়া দেয় তাওহীদ বিশ্বাসের অনির্বচনীয় প্রেরণায়। সমস্ত মানুষই এক, এক-এরই সৃষ্টি, এক আদেমরই সন্তান। মানুষ মানুষের প্রভু হইতে পারে না, মালিক হইতে পারে না। মানুষ কখনো মানুষের জন্য আইন ও জীবন-বিধান রচনা করিতে পারে না। সমস্ত মানুষ সমান ভাবে এক প্রভুরই অধীন দাস, সবই সেই একেরই মালিকানা সম্পত্তি, সেই একেবারেই বিধান ও আইন পালন করিতে বাধ্য নিখিল জগতের মানব জাতি। তওহীদের এই মৌলিক ধারণা-ই মানব সমাজের স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি স্থাপিত করিতে পারে, ইহাই আনিতে পারে এক অনাবিল মিলন ও ঐক্য। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার মানুষ চলিয়াছে কোন দিকে। প্রভুত্বও মালিকানা লইয়া আজ পৃথিবীব্যাপী চলিয়াছে পাশবিক কাড়াকাড়ি। মানুষে মানুষে বিবেধ ও বৈষম্যের আকাশ জোড়া প্রচীর আজ গোটা মানব গোষ্ঠীকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন জাতি আজ জাতীয়তার তীব্র ঝাঁজালো মদ পান করিয়া উন্মাদ হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তীব্র বিষে দুনিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় আজ মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে। তাই আজ তাহারা খাচা ভাঙ্গা ক্ষুধার্ত সিংহের মত একে অন্যের উপর লফাইয়া পড়িতেছে একটা দুর্মদ জিঘাংসাবৃত্তি লইয়া।চারিদিকে স্বার্থের সংঘাত-শক্তির রক্ত-সংগ্রাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জের শেষ না হইতেই অধিকার লইয়াই আজিকার দুনিয়ার এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তদুপরি বর্তমান বিজ্ঞান এই সংগ্রামের প্রয়োজনারূপ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ইহাতে ঘৃতাহুতি দিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান মানব মনের হিংস্রাভাবকে উত্তেজিত করিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয় নাই। মানুষ তাই আজ শুধু অন্যের হরণ করিতে, অন্যের বুকে ছুরি বসাইতে কিংবা অন্যের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিতেই উদ্যত। মানুষের সাথে মানবোচিত ব্যবহার করিতে মানুষকে ভালবাসিতে, বিচার ইনসাফের সহিত পরের অধিকার দান করিতে আজ কেহই রাজী নয়। আর ইহাই হইতেছে বর্তমান সভ্য দুনিয়ার চরম অসভ্যতা। আরো একটু অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিলে পরিস্কার বুঝিতে পারা যায় যে, প্রভুত্ব ওমালিকত্ব লাভের এই যে প্রবল উন্মাদনা মানুষের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, বস্তত: ইহাই হইতেছে বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য; ইহাই দুনিয়াব্যাপী এই অশান্তির

মূলীভূত কারণে। যতদিন মানুষকে নিরুংকুশ প্রভুত্ব ও অধিনায়কতার অধিকারী বলিয়া মনে করা হইবে, ততদিন তাহা লাভ করিবার জন্য একটা প্রবল পাশবিক লালসা মানব মনকে দুর্মদ করিয়া তুলিবেই আর ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্যার কোন সমাধানই হইবে না। সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, ইহা ক্রমশ : আরো জটিল আকার ধারণ করিবে এবং আরো অধিকতর শক্তিশালী ও ধ্বংসকারী অস্ত্র আবিস্কার লইয়া চলিবে দুর্বার প্রতিযোগিতা।

কাজেই অতিবড় সত্য কথা, আজ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে যে, মানুষ কখনই মানুষের প্রভু হইতে পারে না। পৃথিবীর ধন-সম্পত্তির নিরুংকুশ মালিক মানুষ হইতে পারে না এবং মানুষের জন্য মানুষের জন্য মানুষ মূলগতভাবে কোন আইন-ই রচনা করিতে পারে না। পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত করিতে হইলে আজ আমন এক প্রভুর সন্ধান করিতে হইবে-যিনি নিজে বিরাট ও অপ্রতদ্বন্দ্বী ও অসীম শক্তির মালিক, যাঁহার সমীপে মাথা নাত করিতে, যাঁহার রচিত আইন পালন করিতে দুনিয়ার কোন মানুষই একবিন্দু কুণ্ঠাবোধ করিতে পারে না। এবং যিনি নিজজ্ঞান ও প্রতিভার বলে মানুষের প্রকৃতি, মনস্তত্ব, প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হইবেন, মানুষের জন্য যিনি এমন নিয়ম-কানুন রচনা করিতে পারিবেন, যাহা নির্ভুল ও সর্বব্যাপক হওয়ার সর্বব্যাপক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশী উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ব সম্মুখে রাখিয়া যে কেহ চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, উল্লেখিত গুণাবলীর অধিকারী এই বিশ্বভূবনে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেহই হইতে পারে না। শক্তির আঁধার তিনি, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তাঁহার জ্ঞান ও প্রতিভার কোন সীমা নাই, নাই কোন তুলনা। মানুষের ভাল মন্দ তিনি ছাড়া আর কেহই বুঝে না বলিয়া মানুষের জন্য অন্য কেহই জীবন বিধান রচনা করিতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তআলা যে আইন-ই রচনা করিবেন তাহা সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে তাহা নিখিল মানুষের নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে। কেননা তিনি সকলেরই বন্দেগী পাইবার একমাত্র অধিকারী। তাহার রচিত আইন নিখিল মানুষের সকল পর্যায়ের সকল দেশের, বর্ণের ভাষার ও শ্রেণীর মানুষের নিকট সকল কালে সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে। কোন মানুষই তাঁহার আইন পালন করিতে কোনই দ্বিধাবোধ করিবে না।

আজ দুনিয়ার মানুষ নিত-সংঘটিত যুদ্ধ বিগ্রহের অভিশাপ জর্জরিত, অতিষ্ঠ ও ওষ্ঠাগতপ্রাণ। আজ তাহারা সত্যিই শান্তি চায়। কিন্তু মানবতার চিরন্তন দুশমনেরা একদিকে যেমন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মের বিরোধীতা করিতেছে, তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তার প্রভূত্বের প্রকৃত অধিকারকে অমান্য এবং তাঁহার

দেওয়া জীবন-বিধানকে উপেক্ষা য়া নিজেরাই মানুষের প্রভু হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। বস্তুত: এইরূপ অস্বাভাবিক কার্যকলাপের দরুণ বিশ্ব-শান্তি বারবার ক্ষুন্ন হইতেছে, ব্যাহত হইতেছে। সেইসব দুশমনেরা মাঝেমাঝে বিশ্ব-শান্তির জন্য বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপনের যে জল্পনা কল্পনা করিতেছি প্রকৃত পক্ষে উহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অশান্তি সৃষ্টিরই মস্ত বড় কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। অতীত ও বর্তমান জাতিসংঘই উহার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু বাস্তবাইক পক্ষেই যদি তাহারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকে আর সেই উদ্দেশ্যে যদি তাহারা বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রাহান্বিতই হয়, তাহা হইলে আজ তাহাদের সর্বপ্রথম এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে:

প্রভুত্ব, আইন রচনার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কাহারোই নাই-থাকিতে পারে না। প্রথমেই মানবীয় প্রভুত্বকে স্পষ্ট ভাষায় ও উদাত্ত কণ্ঠে অস্বীকার করিতে ইহবে। আর সেই সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে-একমাত্র আল্লাহকে। আর প্রভুত্ব ও আইন রচনার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় কেবল এক আল্লাহকেই বর্তমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, মানিয়া লইতে হইবে। দুনিয়ার মানুষ ধন-সম্পদ-উৎপাদন-উপায় এবং এই রাজ্য ও রাজত্ব সব কিছুর উপর একমাত্র আল্লাহর দেওয়া আইন-বিধানকে জারি করিতে হইবে। বস্তুত: ইহাই হইতেছে তাওহীদ। এই দুনিয়ার নির্লিপ্ত শান্তি স্থাপন করিতে হইলে ইহার শুধু যে গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহাই নহে, ইহা ভীন্ন কোন উপায়ই মানুষেরই মানুষের থাকিতে পারে না, কোন পন্থাই আর নাই। পৃথিবীর স্বার্থপর রাজনীতিক আর রাষ্ট্রকর্তারা যদি আজিও ইহা অস্বীকার করে, তবে তাহাদের অন্ধত্ব, তাহাদের অহমিকা ও কুপমন্ডুকতা ছাড়া আর কিছু নয়। দুনিয়ার সুস্থ বিবেবসম্পন্ন মানুষের সুস্থ চিন্তার ধারক ও বাহকেরা আজ তাওহীদের সত্যতা ও গুরুত্বকে পূর্ণ মাত্রায় স্বীকার করিতেছে, মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে, মস্তক অবনত করিয়া মানিয়া লইতেছে ও মহাসত্যকে। তাই আজ দুনিয়ার নিখিল মানুষকে আমরা আহ্বান জানাইতেছে আকুল কণ্ঠে:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ رَبَّكُمْ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - (البقرة)

হে মানুষ : দাসত্ব কবুল কর তোমাদের সেই এক প্রতিপালকের যিনি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের পূর্ববর্তী সব মানুষকে। সম্ভবত: ইহারই সাহায্য তোমরা রক্ষা পাইতে পারিবে সকল প্রকার ধ্বংস ও ক্ষতি হইতে।

তাওহীদ মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের একমাত্র শৃঙ্খলা স্থাপক, তওহীদ বিশ্বশান্তির একমাত্র বুনিয়াদ। দূর উর্ধ্বের শূন্যলোকে ঝিকমিক করে যে লক্ষ তারা, শুক্লপক্ষের মুক্ত আকাশে জ্যোৎস্না মধুর প্লাবন বহায় যে চাঁদ, অন্ধকারের বুক দীর্ণ করিয়া উদয় গগনের পূর্ব তোরণে ফুটিয়া ওঠে যে রঙীন ঊষার দৃপ্ত লালিমা, অমানিশার অবসানে দিগন্ত উদ্ভাসিত করে যে দীপ্ত সুর্য্য, ইহারা সকলেই লক্ষকণ্ঠে বারংবার জানায় এই তওহীদেরই সজীব সত্যতা। বিশ্ব-প্রকৃতি, গ্রহলোক ও সৌরজগতের অটুট শৃংখলার মর্মকথা হইতেছে এই তাওহীদ। প্রভাতের মৃদু সমীরণে, সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির বর্ণে-গন্ধে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, পাখীর কাকলিতে, পত্রপল্লবের মর্ম ধ্বনিতে, মেঘমালার গুরু-গম্ভীর নাদে, বিদ্যুতের চমকে, ঝড়ের তান্ডবনৃত্যে, স্রোতের গতিবেগে, কল্লোলের কুলকুল গানে, শিশুদের কলহাস্যে ও রূঢ় কান্নায় রহিয়াছে তাওহীদের শাশ্বত প্রমাণ। তাওহীদ সর্বগ্রাসী তাওহীদ সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাওহীদের জ্বলন্ত নিদর্শন। তাওহীদ তাই অনস্বীকার্য; তাওহীদ তাই অপ্রতিহত।

দৃষ্টিমান তাওহীদের জ্বলন্ত প্রমাণ দেখিয়া বিমুদ্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞানী তাহার সন্ধান পাইয়া জ্ঞানের মশাল জালাইয়াছে। কবি তাহা অনুভব করিয়া মহাকাব্য রচনা করিয়াছে, শিল্পী তাহার রূপ দিতে অবাঞ্চিত প্রচেষ্ট চালাইয়াছে। তাওহীদ সকল শেণীর মানুষের অনাবিল দৃষ্টিতে, স্বচ্ছ হৃদয়ে, নির্ভুল বিচারের মানদন্ডে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, যুক্তিতে শাণিত কষ্টি পাথরে অতীব বলীষ্ঠ ভংগীতে স্বীকৃতি পাইয়াছে। তাওহীদ তাই সর্বজনগ্রাহ্য।

মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র যতদিন এই তাওহীদকে স্বীকার করিয়াছে এবং উহারই বুনিয়াদে নিজকে সংগঠিত ও উহার দ্বারা নিজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াছে ততদিন তাহাদের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে প্রতি দিকে ও বিভাগে অনাবিল শান্তি ও সমৃদ্ধির অমিয়ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, ততদিন সর্বত্র বিরাজিত রহিয়াছে ক্রমবিকাশ, উৎকর্ষ ও অগ্রগতি। কিন্তু যখন উহাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে, তখনই জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুরু হইয়াছে মহা ভাঙন, সর্বাত্মক বিপর্যয়। জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে; সুবিচার ও পরার্থপরতা, প্রেম ও সহানুভূতি, নৈতিকতা ও আর্দশবাদিতা, কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান, ন্যায় নিষ্ঠা ও পরার্থপরতা, পরকালের ভয় ও মহাশান্তির আতংক-সবকিছুরই অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। মানুষ হারাইয়াছে তাহার মনুষ্যত্ব, হারাইয়াছে তাহার সমস্ত বিত্ত ও সম্পদ। তাই বর্তমানের মানুষ হইয়াছে সর্বহারা, সর্বশ্বান্ত।

মানুষ প্রধানতা : দুইটি জিনিসের সমন্বয়। একটি তাহার মনুষ্যত্ব আর অন্যটি পশুত্ব, পাশবিকতা। মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা তওহীদে; আর পাশবিকতার লীলাক্ষেত্র হইতেছে শিরক ও কুফরি। তওহীদের পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বের অধীন, দাসানুদাস ও হুকুম বরদার হইয়া। ইহাই মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক আবস্থা। কিন্তু বর্তমানে পশুত্ব হইয়াছে শৃংখলমুক্ত, স্বাধীন ও

স্বেচ্ছাচারী। আর মনুষ্যত্ব হইয়াছে পর্যদস্ত, পদদলিত। মানুষ হারাইয়াছে তাহর মহিমা, সকল বৈশিষ্ট্য। তাহার ভিতরকার পশুত্ব আগলমুক্ত হইয়াছে, বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে সমস্ত পরিমন্ডল ও পরিবেশ। হিংস্র বানাইয়া দিয়াছে সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে। ক্ষুধার্ত শার্দুলের ন্যায় হুংকার দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার সকল জিঘাংসুবৃত্তি। মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তাইত এত হিংসা বিদ্বেষ; জ্বলিয়া উঠিয়াছে যুদ্ধের প্রলয়ংকর লেলিহান শিখা। স্বার্থের সংঘর্ষ, প্রভুত্বের লড়াই নিত্য তীব্রতর। এই অবস্থা যদি আরো কিছুদিন চলে, মানুষের আভ্যন্তরীণ পশুকে যদি বন্দী করা না যায় তবে সভ্যতার সুউচ্চপ্রসাদ চূর্ণ হইয়া যাইবে, ধ্বংস হইয়া যাইবে সমগ্র জনপদ পৃথিবী। মানুষরূপী এই পশুদের দেহটাও তখন রক্ষা পাইবে না।

তাই প্রয়োজন হইয়াছে তাওহীদের, আবশ্যক হইয়াছে পশুত্বকে বন্দী করার, মানবত্বকে জাগ্রত ও জয়ী করার; অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে তাওহীদের পুন:প্রতিষ্ঠার। পশুত্বের আজ দমন করিতে হইবে, নির্মূল করিতে হইবে তাহার লেলিহান জিহ্বা, চূর্ণ করিতে হইবে এই বিষধর সর্পের দাঁতগুলি। আর তাওহীদ ছাড়া এ-কাজ সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন হইয়াছে তওহীদের। তাওহীদ তাই অপরিহার্য। চাই তাওহীদের পুন:প্রতিষ্ঠা।

তাওহীদকে হারাইয়া এযুগের মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র মহাসংকটের সম্মুখীন। বর্তমান সময় সকল প্রকার দু:খ দুর্ভোগ, অশান্তি ও নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনার মূলীভূত কারণ ইহাই। তাই, যদি মানুষকে রক্ষা করিতে হয়, আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে যদি বাঁচাইতে হয়, সমাজকে সকল প্রকার উচ্ছৃঙ্খলা-বিশৃংখলা, অবিচার ও অত্যাচার হইতে যদি গড়িয়া তুলিতে হয় মানুষের উপযোগী কোন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তাহা হইলে তাওহীদের পুন:প্রতিষ্ঠা ব্যতীত উপায়ন্তর থাকিতে পারে না। তাই তাওহীদ বিশ্ব মানবতার সংরক্ষক।

তাওহীদী ব্যবস্থা ছাড়াও কি মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব? .....কে তাহা করিবে? কিসের সাহায্য করিবে, করিবে কেমন করিয়া? পাশ্চাত্য গণতন্ত্র মানুষকে দিয়াছে চরম বঞ্চনার আঘাত। বলা হইয়াছিল: মানুষই হইবে মানুষের শাসক, রাষ্ট্র ও সরকার হইবে মানুষের কল্যাণকামী, একনিষ্ঠ সেবক হইয়াছে কি? হয় নাই। মানুষকে পারে নাই মানুষের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিতে পারে নাই পৌঁছাইয়া দিতে বিপুল প্রাচুর্যপূর্ণ ঐশ্বর্য হইতে তাহার নায্য হিসসা। বরং সেখানে চলিয়াছে স্বেচ্ছাচারিতা, চলিয়াছে সংখ্যাগরিষ্ঠের একচেটিয়া শাসন-নিষ্পেষণ, চলিয়াছে ব্যক্তি মালিকানার অসীম অবাধ সুযোগে অপ্রতিরোধ্য শোষণ ও বঞ্চনা। একদিকে প্রাচুর্য ও বিলাস-বাসনের স্তুপ জমিয়াছে, অপর দিকে উহারই পাশাপাশি রচিত হইয়াছে অভাব দারিদ্রের রসাতল। এ-আঘাত চুরমার করিয়া দিয়াছে। এ আঘাত মানুষ কোন দিনই ভূলিতে পারে না-ভূলিতে পারিবে না।

ইহার পর আসিল সমূহবাদ-সমাজতন্ত্রবাদ। মুখে বিপ্লবের বাণী: ব্যক্তি মালিকানা হরণ করিতে হইবে: বিত্তসম্পত্তি, জমি ও কারখানা, উৎপাদনের যাবতীয় উপায়ের উপর কায়েম করিতে হইবে সামগ্রিক মালীকানা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। বলা হইল, ইহাতেই শোষণ ও বঞ্চনার অবসান, ইহাতেই মানবতার মুক্তি। কিন্তু পরিমাণ কি হইয়াছে? ইহার পরিণতি হইয়াছে মানবতার পক্ষে সর্বাধিক মারাত্মক। মানুষ হারাইয়াছে তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র, হারাইয়াছে তাহার স্বাভাবিক মানবিক আজাদী চিরকালের জন্য। মুক্তির আকাংখায় হইয়াছিল যে যাত্রার শুরু মুষ্টিমেয় কয়েকজন সর্বোচ্চ কর্মকর্তার চিরদাসত্বের নিগড়ে বন্দী হওয়াই হইয়াছে তাহার পরিণতি। মানুষ হইয়াছে নিষ্প্রাণ কাঁচামাল, আর উহার উপর চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে সর্বনিষ্পেষণকারী যাঁতাকল।মানুষের মুক্তি সম্ভব হইল না, আকাশ কুসুম হইয়াই থাকিল তাহা চিরদিনের জন্য।

ইহার কারণ কি? কারণ একটি-ই রহিয়াছে ইহার মূলে এবং তাহা এই যে, তাওহীদ ভিত্তিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনটিই মানুষের স্বভাব সম্মত নয়। একের পর এক যত ব্যবস্থাই মানুষের জন্য চিন্তা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই প্রমাণিত হইয়াছে নিত্যন্ত অস্বভাবিক। অস্বাভাবিক ব্যবস্থা মানুষকে কোনদিনই একবিন্দু কল্যাণ দিতে সমর্থ নয়। তাই এ ব্যর্থতা। অত:পর আর নতূন কোন ব্যবস্থাও আসিবার নাই। বিশ্বমানবতা আদর্শ ও মতবাদের দিকদিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, নি:শেষ হইয়া গিয়াছে উহার নতুন কোন আদর্শ দেওয়ার ক্ষমতা। অতএব তাওহীদী ব্যবস্থা ছাড়া মানবতার মুক্তি নাই। তাওহীদ তাই বিশ্ব-মানবতা একমাত্র আশ্রয়, তাওহীদ তাই মানুষের একমাত্র ভবিষ্যৎ। অতএব চাই তাওহীদের পুন: প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তাওহীদের পুন: প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব? কিভাবে আর কোন পদ্ধতিতে কাজ করিলে পৃথিবীর বুকে তাওহীদকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। বস্তুত: এই প্রশ্নই আজ প্রচন্ড, এই জিজ্ঞাসা-ই আজ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে তাওহীদ আদর্শবাদিদের সম্মুখে এবং ইহার সঠিক জওয়াব নির্ধারণ করিতে হইবে তাহাদেই।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার উপায় কি, এ প্রশ্ন লইয়া বেশী চিন্তা করার, বেশী মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন করেনা। কেননা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার একাজ দুনিয়ার আজ অভিনব কিছু নয়, অনৈতিহাসিকও নয়। মানব ইতিহাসের প্রথম দিন হইতেই ইহার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন চলিয়াছে, দুনিয়ায় বারে বারে হইয়াছে ইহার প্রচার, ইহার প্রতিষ্ঠা। যুগে যুগে নবীগণ আগমণ করিয়াছেন তাওহীদের বিপ্লবী বাণী লইয়া তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও মিশন লইয়া। তাঁহারা ইহার জন্য যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, মানিয়া চলিয়াছেন যে কর্মসূচী, প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইতেছে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার চিরন্তন কর্মনীতি, স্বাভাবিক পদ্ধতি। তাই ইহার জন্য আজিও সেই পন্থা-ই অনুসরণীয়। উহার ব্যতিক্রম হইলে তওহীদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব

নয় কোন মতে। তাই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ একান্তভাবে সম্পন্ন হইবে সেই চিরন্তন কর্মনীতিতে।

নবীগণ প্রথমে তাওহীদের বিপ্লবী বাণী প্রচার করিয়াছেন, আহবান জানায়াইছেন সে বাণী মনে-প্রাণে কবুল কারা জন্য, জীবনে মানিয়া চলার জন্য। যাহারা তাহা কবুল করিয়াছে, তাহাদের লইয়া গঠন করিয়াছেন এক বিপ্লবী জন-সংস্থা। উহার অন্তর্ভূক্ত মানুষদের মন-মগজ ও চরিত্রকে তাঁহারা সংশোধন করিয়াছেন তাওহীদের আলোকে। যাহা কিছু উহার বিপরীত দেখিয়াছেন তাহা দূরীভূত করিয়াছেন জ্ঞান ও চেতনার ভিত্তিতে, করিয়াছেন ক্রমিক নিয়মে, বিকাশমান নীতির ক্রম-অনুসরণে। আজিও সেই নিয়মই অনুসরণীয়: ব্যতিক্রম নয়।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এ প্রচেষ্টার প্রথম ওএকমাত্র ভিত্তি হইবে তাওহীদের বিপ্লবী কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ইহার ভিত্তিতে ব্যক্তি গঠন করিতে হইবে, গঠন করিতে হইবে ব্যক্তির মন-মগজ, চরিত্র ও জীবন। উহারই উপর ঢালিয়া রচনা করিতে হইবে তাওহীদের প্রতিমূর্তি, তাওহীদের বাস্তব প্রতীক। তাই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য এক তাওহীদী জামায়াত, তাওহীদের বাস্তব প্রতিষ্ঠাকামী এক বিপ্লবী জনসংস্থা।

তাওহীদী জামায়ের ভিত্তি যেমন তাওহীদ, উহার কর্মসূচীও হইবে তাওহীদের প্রচার। তাওহীদের আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পুনগর্ঠিত সমুদ্ভাবিত করাই হইবে উহার একমাত্র উদ্দেশ্যে, চূড়ান্ত লক্ষ্য।

তাওহীদের প্রতীক এই জামায়াত অংকুরিত হইবে তাওহিদময় জমীনের বুকে। জমীন তাহার সর্বশক্তি দিয়া, আকাশ-বাতাস তথা সমগ্র প্রকৃতি তাহার সামগ্রিক উপাদান দিয়া ক্রমে শক্তিশালী ও জোরদার করিয়া তুলিবে তাওহীদের এই অংকুরকে। তাওহীদের এ অংকুর ক্রমে বর্ধিত হইয়া রূপায়িত হইবে এক বৃক্ষে। বৃক্ষ উহার কাণ্ড ও শিকড় মজবুত করিয়া গ্রথিত করিবে সমাজের সরজমিনে। বাহির হইবে উহার শাখা ও প্রশাখা, পত্র ও পল্লব। এই পূর্ণাঙ্গ তাওহীদী বৃক্ষই বিশ্ব-মানবকে দিতে পারিবে তাওহীদী জীবনের অমৃত। তখনই মানব সমাজ সমাজ হইবে তাওহীদময়, তাওহীদী ভাবধারায় সঞ্জীবিত।

তাওহীদের এ বিপ্লবী আন্দোলনে কাঁপিয়া উঠিবে শিরক ও বিদয়াতের গগচুম্বী প্রসাদের-ভিত্তি, জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইবে শীরকী আকীদা ও আমলের সব স্তুপীকৃত আবর্জনা ও জঞ্জাল। ভূমণ্ডল হইবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। মানবতা পাইবে চিরমুক্তি নফসের দাসত্ব হইতে, মানবতার অবমাননা হইতে। তখনই মানুষের প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি, মনুষ্যত্বের সার্থক বিকাশ, চূড়ান্ত বিজয়। মানুষের এই জীবন হইবে সার্থক সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন।

তাই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই তাওহীদের বিপ্লবী আন্দোলন আর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই এক তাওহীদী জনসংস্থা।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَىْ الْخَيْرِ وَيَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وُاُلئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُوْنَ - (ال عمران)

তোমাদের মধ্যে অবশ্যই ইহবে এমন এক উন্নত, যাহারা কল্যাণের দাওয়াত দিবে, ভাল কাজ কাজের নির্দেশ দিবে এবং সব মন্দ কাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখিবে। প্রকৃতপক্ষে ইহারাই সফলকাম।

–সমাপ্ত–